বেবোগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

১

জমাট অন্ধকারের মধ্যে ভদ্রলোক যেন ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরনে ছিল গলাবন্ধ কোট আর আটপৌরে একটা ধুতি। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ—কিম্ভূতকিমাকার চেহারা ভদ্রলোকের।

বারবার তিনি গলির মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। গলির মুখে করপোরেশনের আলো জ্বলছে।

কেন জানি না অন্ধকার ছেড়ে ভদ্রলোকের আলোর নীচে দাঁড়াতে সাহস হচ্ছিল না।

হয়তো বা অপমৃত্যুর আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ভদ্রলোক কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিলেন না।

গলাবন্ধ কোটের বুকপকেটে ঘড়ি ছিল। একসময় ভদ্রলোক ঘড়ি দেখলেন।

রাত দুটো বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি ···

আরও পাঁচ মিনিট তাঁকে অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে আড়াল রেখে অপেক্ষা করতে হবে।

গলির আরও একটু ভেতরের দিকে ভদ্রলোকের বাড়ি। প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে প্রাণ নিয়ে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন। কেউ জানে না। বাথরুমের ভাঙা জানলা টপকে বহুকষ্টে তিনি পালিয়ে বেঁচেছেন। না পালালে এতক্ষণ তাঁর জীবন রক্ষা পেত না। এতদিনের পরিশ্রম বৃথা হয়ে যেত।

রাত দুটো বাজতে চলল।

ভদ্রলোক ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে পড়তে লাগলেন।

সেটা ডিসেম্বর মাস। সন্ধ্যে হতেই হিম পড়তে শুরু করেছে। মাঝরাতে পথঘাট কুয়াশার জন্যে অস্পষ্ট লাগে।

ঐ শীতে ভদ্রলোক ঘামছিলেন।

অথচ গলি ছেড়ে পালাতেও পারছিলেন না। আরও দু'মিনিট···এক একটা মিনিট তখন এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছিল।

একসময় রাত দুটো বাজল।

এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই একটা ইংলিশ মডেলের মোটরগাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে গলির ভেতর ঢুকল।

গাড়ি দেখে ভদ্রলোক আশ্বস্ত হলেন না মোটেই। বরং চকিতে ফুটপাথের পাশেই যে ডাস্টবিনটা ছিল তার পাশে গুঁড়ি মেরে আত্মগোপন করলেন।

গাড়িটা মন্থর গতিতে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ডাস্টবিনের কাছে। ভদ্রলোক ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকালেন গাড়ির আরোহীর দিকে।

আরোহী গাড়ি থেকে নামলেন না। দরজা খুলে দিয়ে শুধু বললেন,—ভয়ের কিছু নেই রমাশঙ্করবাবু। শীগ্‌গির গাড়িতে উঠে আসুন।

—কে আপনি?

আতঙ্কে ভদ্রলোকের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। বহুকষ্টে প্রশ্ন করতে গাড়ির আরোহী বললেন,—আমি, প্রফেসর ত্রিদিব সেন।

—আপনি এসেছেন—!

ভদ্রলোক মুহূর্ত দেরি না করে প্রাণের দায়ে ছুটে গিয়ে গাড়ির মধ্যে যেন আছড়ে পড়লেন।

গাড়ির দরজা বন্ধ করার সময় আর দিলেন না আরোহী, ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে পড়তেই তীরবেগে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললেন,—গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে সীটের ওপর শুয়ে পড়ুন রমাশঙ্করবাবু।

রমাশঙ্করবাবু আদেশ পালন করে সীটের ওপর শুয়ে শঙ্কিতকণ্ঠে বললেন,—আমার বাড়ির দিকে যাবেন না প্রফেসর। পাশের গলি দিয়ে বড়রাস্তায় পড়ুন।

—আপনার ভাইপো মণিশঙ্কর কোথায়?

—তাকে সংগ্রাম সিং খুন করেছে।

—সেকি—

—আমার চোখের সামনে মণিশঙ্কর গুলি খেয়ে পড়ল। আমি কোনরকমে বাথরুমের জানলা দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

—ম্যাপটা কোথায়?

—রাস্তায় letter box-এ post করে দিয়েছি।

গাড়িটা ততক্ষণে পাশের গলি ছেড়ে বড়রাস্তার কাছবরাবর এসে পড়েছিল। রমাশঙ্করবাবু মাথা তুলতেই প্রফেসর সেন ধমকে উঠলেন,—মাথা তুলবেন না। গলির মুখে লোক থাকতে পারে।

কথামত রমাশঙ্কর পিছনের সীটে মুখ গুঁজে শুয়ে রইলেন। প্রফেসর সেনের অনুমান মিথ্যা নয়, গলির মুখে পৌঁছুতেই দেখা গেল একটা কালো অ্যামব্যাসাডর তীরবেগে এগিয়ে আসছে।

প্রফেসর সেন প্রস্তুত ছিলেন। তিনি জানতেন সংগ্রাম সিংয়ের মত প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে প্রতিটি মুহূর্ত যে কোন আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ইংলিশ মডেলের মোটরগাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে···
[পৃষ্ঠা ১৬২

কালো অ্যামব্যাসাডরটা দশ গজের মধ্যে এসে পড়তেই তিনি এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অপর হাতে রিভলভার তাক করে গুলি চালালেন।

গুলি গিয়ে লাগল অ্যামব্যাসাডরের উইণ্ডস্ক্রীনে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা পাক খেয়ে ধাক্কা মারল গলির মুখের বাড়িটার গায়ে।

প্রফেসর ত্রিদিব সেনের লক্ষ্য আজ পর্যন্ত কখনও ব্যর্থ হয়নি। তাছাড়া যে রিভলভার থেকে তিনি গুলিটা ছুঁড়েছিলেন সেই বিশেষ অস্ত্রটি নেহাত মামুলী ধরনের নয়। বছরখানেক আগে তিনি যখন পশ্চিম জার্মানী গিয়েছিলেন সেই সময় জনৈক জার্মান অস্ত্রবিদ্‌ রিভলভারটি প্রফেসন ত্রিদিব সেনকে উপহার দেন।

রিভলভারটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওটি ব্যবহার করার সময় ব্যারেলে চাপ দিয়ে বাড়ান

কমান যেতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলে টমিগানের বুলেটও ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং তার রেঞ্জ টমিগানের মত।

ফলে, একটি বুলেটেই সেযাত্রায় প্রফেসর সেন এবং রমাশঙ্কর রক্ষা পেয়েছিলেন। অ্যামব্যাসাডরের উইণ্ডস্ক্রীন ফুটো করে বুলেটটা চালকের মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিয়েছিল, আর সেই কারণেই গাড়িটা পাক খেয়ে ধাক্কা মারল গলির মুখে বাড়িটার গায়, নইলে আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিস্তার ছিল না। ওদের সঙ্গে ছিল স্টেনগান। সংখ্যায় ওরা ছিল পাঁচজন। দলবদ্ধভাবে ওরা এসেছিল রমাশঙ্কর চাটুয্যেকে অপহরণ করার জন্যে। তা যদি সম্ভব না হত তাহলে ওরা নিশ্চিত রমাশঙ্করবাবুকে নৃশংসভাবে হত্যা করে যেত।

সংগ্রাম সিং চায় নিষ্কণ্টক হতে।

সে চায় বাহ্‌মনীরাজ আহম্মদ শাহ কর্তৃক লুণ্ঠিত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হতে।

সে বহুকাল আগের ঘটনা। ১৪২২ সালে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সঙ্গমবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি প্রথম দেবরায়ের পৌত্র দ্বিতীয় দেবরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য সিংহলের উপকূল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় দেবরায় ছিলেন সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। যত বড় যোদ্ধা ঠিক ততই শৌখিন। বহু দেশবিদেশের বহু অমূল্য রত্ন তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। সোনার মন্দিরে সোনার বিষ্ণুমূর্তি তিনি নিত্য পূজা করতেন। সেই মূর্তিটি যে সিংহাসনের ওপর থাকত সেই সিংহাসনটি লম্বায় ছিল চার ফুট এবং চওড়ায় তিন ফুট। বলা বাহুল্য সিংহাসনটি সোনার এবং তার গায়ে বসান ছিল পঞ্চাশটি সর্বশ্রেষ্ঠ গোলাপী হীরকখণ্ড। এক একটি হীরকখণ্ডের ওজন ছিল প্রায় দুশো রতি।

অত বড় হীরে পৃথিবীতে বিরল। হীরে ছাড়া আরও নানান ধরনের রত্ন ছিল। সব কিছু মিলে ঐ বিষ্ণুমন্দিরের সিংহাসনটি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

বিজয়নগর রাজ্যের পাশেই ছিল বাহ্‌মনী রাজ্য।

এই দুই রাজ্যের মধ্যে চিরশত্রুতা। বাহ্‌মন সুলতান ফিরোজ শাহ শক্তিশালী শাসক ও সাহিত্যানুরাগী হলেও হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। বিষ্ণুমন্দিরের রত্নখচিত সিংহাসনের কথা শুনে একবার ছদ্মবেশে বিজয়নগরে গিয়ে দেখে আসার লোভ সংবরণ করতে পারেননি।

এবং সিংহাসনটি দেখার পরই তিনি বিজয়নগর আক্রমণ করেন। দেবরায় শান্তি-প্রিয় মানুষ ছিলেন। আর সেই কারণে যুদ্ধে তাঁর চরম পরাজয় ঘটে। সুলতান ফিরোজ শাহ বিষ্ণুমন্দির লুণ্ঠন করে রত্নখচিত বহুমূল্যবান্ সিংহাসন অধিকার করে নিয়ে যান। দ্বিতীয়

দেবরায় কয়েক বছর পরেই বাহ্‌মনী রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু সে যুদ্ধেও তিনি জয়লাভ করতে পারেননি। ফলে রত্নখচিত সিংহাসনটি বরাবরের মত তাঁকে হারাতে হয়।

সেই সিংহাসন অভিশপ্ত। ফিরোজ শাহ রত্নখচিত সিংহাসন অধিকার করার কয়েক বছরের মধ্যেই রাজ্য হারালেন। সুলতানের ভাই আহম্মদ শাহ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

রাজ্য হারিয়েও ফিরোজ শাহ রত্নখচিত বিষ্ণুসিংহাসনটি পরিত্যাগ করেননি। গোপনে সিংহাসনটি নিয়েই তিনি বাহ্‌মনী রাজ্য পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন।

তার পর ?

তার পরের কাহিনী সর্বজনবিদিত নয়।

১৪২২ সাল থেকে আজ ১৯৭০ সাল।

মাঝখানে পাঁচশো আটচল্লিশ বছর কেটে গেছে। একমাত্র ইতিহাস ছাড়া সুলতান ফিরোজ শাহ আর রত্নসিংহাসনের কথা কেউ মনে রাখেনি।

ফিরোজ শাহ রত্নসিংহাসন নিয়ে কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলেন কেউ জানে না। তবে মনে হয় তিনি বিন্ধ্যপর্বতের গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাকি জীবন আত্মগোপন করে ছিলেন। তা যদি না হবে তবে আজকের এই কাহিনীর সূত্রপাত হত না। রমাশঙ্কর চাটুয্যেকে সংগ্রাম সিং দেবরায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে চাইত না। আর প্রফেসর ত্রিদিব সেনও উক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তেন না।

* * * *

রমাশঙ্কর চাটুয্যে ছিলেন হায়দ্রাবাদ নিজামের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। নিজামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ইতিহাসের প্রতি অনুরক্ত। তাই ছাত্রাবস্থায় ইতিহাসে এম. এ. পাস করে রিসার্চ আরম্ভ করেন। কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্যই লেখাপড়া ছেড়ে হায়দ্রাবাদে চাকরি নিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন।

নিজাম সেটা জানতেন। তাই রমাশঙ্কর চাটুয্যেকে তিনি হায়দ্রাবাদের যাবতীয় ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োগ করেন।

রমাশঙ্কর বরাবরই উৎসাহী মানুষ। মনের মত কাজ পেয়ে তিনি ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি নিয়ে তিনি পুনরায় রিসার্চ শুরু করেন। এমনি করে বহু বছর কেটে গেল। রমাশঙ্কর সুখেই ছিলেন।

সেবার একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনে নেমে এল দুর্যোগ। ঘটনাটি এইরকম—

হঠাৎ দেবগিরি অঞ্চলে মাটি খুড়তে গিয়ে জনৈক কনট্রাক্টর পাঁচশো বছরের পুরাতন একটি কবরের সন্ধান পায়। কবরের মধ্যে ছিল বহুপুরাতন এক কঙ্কাল-

মূর্তি। নিশ্চয়ই কোন নারীর। কারণ কঙ্কালের গায়ে ছিল বহুমূল্যবান্ অলংকার। কনট্রাক্টরের নাম সংগ্রাম সিং দেবরায়।

কবরে পাওয়া অলংকারগুলি সংগ্রাম সিং আত্মসাৎ করে। শুধু তাই নয়, আরও কয়েকটি কবর পাওয়ার আশায় নিজাম কিছু জানার আগে সে স্থানটি নিজামের কাছ থেকে পঁচিশ বছরের জন্য ইজারা নিয়ে পয়সা খরচ করে প্রায় দশ বিঘে জমি দশ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নেয়। লোককে সে বলতে লাগল সে নাকি ঐ স্থানে জমিতে সার দেওয়ার জন্য সারের কারখানা করবে।···ইত্যাদি—

কিন্তু আসল কথা গোপন রইল না। একদিন নিজামের কানে উঠল। তিনি সংগ্রাম সিংকে ডেকে পাঠালেন।

সংগ্রাম সিং অতি ধূর্ত, অতি লোভী, অতি অর্থপিশাচ। কোনমতেই সে অলংকারের কথা স্বীকার করল না। বললে,—যা শুনেছেন সবই আমার শত্রুপক্ষের মিথ্যা রটনা। আমি যাতে কারখানা করতে না পারি তার অপচেস্টা মাত্র। একটা পুরাতন কবরের সন্ধান পেয়েছি ঠিকই কিন্তু কঙ্কালের দেহে কোন অলংকার ছিল না। আমার মনে হয়, বহু বছর আগে কোন লোক কোন নারীকে হত্যা করে মাটিতে লাশ পুঁতে রেখেছিল।··· ইত্যাদি—

শয়তানের ছলনার অভাব হয় না। সংগ্রাম সিংয়ের মিথ্যাভাষণ ধরার কোন উপায় ছিল না। অগত্যা নিজাম রমাশঙ্করবাবুকে পাঠালেন কঙ্কালটি পরীক্ষা করার জন্য।

রমাশঙ্কর দেবগিরি গেলেন। অতি মনোযোগ দিয়ে কঙ্কাল পরীক্ষা করলেন। কঙ্কালটি পাঁচশো বছরের পুরাতন। ফসিলে পরিণত হয়েছে। সেটা পরীক্ষা করে রমাশঙ্কর একদিন সংগ্রাম সিংকে বললেন,—যেখানে এই কঙ্কালটি পেয়েছিলেন সেই জায়গাটা আমি একবার পরীক্ষা করতে চাই।

সংগ্রাম সিং আপত্তি করেনি। রমাশঙ্করবাবুর অলংকারের প্রতি কোন লোভ ছিল না, তাই তিনি পুরাতন কবরখানার মাটি পাথর ঘাঁটতে শুরু করলেন। প্রায় পনের দিন অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরীক্ষার ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন একটি শিলালিপি।

শিলালিপিতে যে সাংকেতিক ভাষা লেখা ছিল সাধারণ লোকের পক্ষে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব ছিল না বলেই রমাশঙ্কর শিলালিপিটি নিয়ে নিজের দেবগিরির আস্তানায় ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

যাই হোক, রমাশঙ্করবাবু শেষ পর্যন্ত শিলালিপির ওপর খোদাই করা সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আর এমনি তাঁর দুর্ভাগ্য যে যেদিন তিনি পাঠোদ্ধার করলেন সেইদিনই সংগ্রাম সিং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। রমাশঙ্করবাবু অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের লোক। সংগ্রাম সিংকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ঝোঁকের মাথায় গুপ্তকথা ফাঁস করে ফেললেন।

বললেন,—জানো সংগ্রাম সিং এই শিলালিপিতে সাংকেতিক ভাষায় কি লেখা আছে? লেখা আছে, ঐ কঙ্কালটা হচ্ছে সুলতান ফিরোজ শাহের প্রধানা বেগমের। পৃথিবীর যে সবচেয়ে ভাগ্যবান্ পুরুষ, সেই বেগমের কবর খুঁড়ে পাবে এই শিলালিপি।

জানো সংগ্রাম সিং এই শিলালিপিতে সাংকেতিক ভাষায়···

সংগ্রাম সিং হেসে বললে,—তাহলে আমিই সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ।

—হ্যাঁ। তুমি ভাগ্যবান্—

—কিন্তু মৃত বেগমের কঙ্কাল পেয়ে কি লাভ হল? যদি বেগম বেঁচে থাকতেন তাহলে নাহয় কিছু গয়না কিংবা কিছু টাকা পাওয়া যেত।

—তুমি মূর্খ, তাই ওকথা বলছ। জানো এই শিলালিপিতে সাংকেতিক ভাষায় একটা ম্যাপ খোদাই করা আছে। সেই ম্যাপ দেখে বিন্ধ্যপর্বতের কোন একটা বিশেষ গুহায় যাওয়া যায়। আর যদি ঠিকমত জায়গায় পৌঁছুতে পার তবে কি পাবে জানো?

—কি— কি পাওয়া যাবে বাবুজী?

—বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের বিষ্ণুমন্দির থেকে সুলতান ফিরোজ শাহ পঞ্চাশটা গোলাপী হীরে বসান যে রত্নসিংহাসনটা লুণ্ঠন করে এনেছিলেন, সেই সিংহাসনের হদিস পাওয়া যাবে। বুঝলে মূর্খ, বেগমের কয়েকটা অলংকারের চেয়ে সিংহাসনের দাম লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী।

রমাশঙ্করের কথায় সংগ্রাম সিং দেবরায়ের চোখদুটো লোভী নেকড়ের মত চিকচিক করে ওঠে।

(ক্রমশঃ)

দেবগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

২

রমাশঙ্করবাবুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ইতিহাসের কথা বলতে পেলে তিনি আর কিছু চান না। বিশেষ করে সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করে তিনি এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে সংগ্রাম সিংয়ের চোখের দিকে তাকিয়েও তাঁর হুঁশ হয়নি।

তিনি বলতে লাগলেন,—ইতিহাস বলে, মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে দেবগিরির বৈদেশিক আমীরেরা বিদ্রোহী হয়ে দেবগিরি নগর দখল করে নেন। তাঁরা ইসমাইল মাখ নামে একজন আমীরকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু বৃদ্ধ ইসমাইল হাসান নামে অপর একজন আমীরের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। হাসান আলাউদ্দীন বাহমন শাহ, উপাধি নিয়ে বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বুঝলে, এই বাহমনী রাজ্যের আঠারজন সুলতান প্রায় একশো সত্তর বছর রাজত্ব করেছিলেন। ঐ সুলতানেরা ছিলেন অত্যাচারী, ধর্মান্ধ, ব্যভিচারী। শুধু তাই নয়, অন্তর্বিপ্লব, ষড়যন্ত্র আর প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের জন্যে এই সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের ঐশ্বর্য রত্নখচিত অলংকার কবরের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন।

সংগ্রাম সিং দেবরায়ের ইতিহাস শোনার মত ধৈর্য ছিল না। সে শুনতে চায় সুলতান ফিরোজ শাহের কথা, শুনতে চায় দ্বিতীয় দেবরায়ের রত্নসিংহাসনের কথা। তাই রমাশঙ্করের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে,—বাহমনী রাজ্যের আঠারজন সুলতানের ইতিহাস শুনে লাভ নেই বাবুজী। সুলতান ফিরোজ শাহ, আর বিজয়নগরের দ্বিতীয় দেবরায়ের রত্ন-সিংহাসন সম্বন্ধে কি জানেন বলুন—

রমাশঙ্কর হেসে বললেন,—তুমি হচ্ছ আকাট মুখ্যু। দেবরায়ের রত্নসিংহাসন সম্বন্ধে জেনে তুমি কি করবে বাপু? যদি এই শিলালিপির সাংকেতিক ভাষায় কিছুমাত্র সত্য থাকে তবে রত্নসিংহাসনটার একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে তোমার কোন লাভ হবে না বন্ধু। কারণ রত্নসিংহাসন পাওয়া গেলে সেটা হবে জাতীয় সম্পত্তি।

সংগ্রাম সিং হাসল। বললে,—বাবুজী, আমার আসল পরিচয় আপনি জানেন না তাই ওকথা বলছেন। আমার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বিজয়নগরের বাসিন্দা। আমাদের বংশের যে তালিকা আছে সেটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আমরা হচ্ছি বিজয়নগরের প্রথম সম্রাট্ প্রথম দেবরায়ের বংশধর। কালের প্রবাহে আজ আমরা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছি কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি বংশপরম্পরায় রত্নসিংহাসনের আসল মালিক বর্তমানে আমরা—

—ওটা তর্কসাপেক্ষ।

সেকথা শুনে সংগ্রাম সিং হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল,—আপনি ঠিকই বলেছেন বাবুজী, রত্নসিংহাসনের অস্তিত্ব সত্যিই তর্কসাপেক্ষ। পঞ্চাশটা গোলাপী হীরে বসান আছে একটা সিংহাসনে। কথাটা ভাবলেই বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে।

রমাশঙ্কর সাদাসিধে লোক তাই সংগ্রাম সিংয়ের প্রাণখোলা বেপরোয়া হাসির অর্থ বুঝতে পারেননি।

উক্ত আলোচনার পর সংগ্রাম সিং রোজই রমাশঙ্করের কাছে যাতায়াত করতে থাকে। রমাশঙ্করের তখন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। একাগ্রচিত্তে তখন তিনি শিলালিপির সাংকেতিক ভাষা উদ্ধারে ব্যস্ত।

সে এক 'হারকিউলিয়ান টাস্ক'। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রমাশঙ্কর জয়ী হলেন। বহু পুরাতন পুঁথি, পর্যটকদের বিবরণ পড়ে শেষে শিলালিপির ভাষা তিনি হৃদয়ংগম করলেন।

সুলতান ফিরোজ শাহের বেগম নিজে লিখে গেছেন একটা ম্যাপের কথা। সেই ম্যাপ (সাংকেতিক চিহ্ন) দেখে বিন্ধ্যপর্বতের গায়ে গভীর অরণ্যের মধ্যে যে গুহাটির মধ্যে ফিরোজ শাহ্ আত্মগোপন করেছিলেন, সেখানে যাওয়া যায়। বাইরে থেকে গুহাটি নাকি দেখা যায় না। কেবলমাত্র কয়েকটি চিহ্ন অনুসরণ করে সেখানে যেতে হবে।

বেগম লিখে গেছেন, আহম্মদ শাহের ভয়ে সুলতান তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এবং রত্নসিংহাসন সেই গুহার অভ্যন্তরে দেওয়ালের গায়ে পুঁতে রেখেছেন। একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

বেগম জেনে ফেলেছিলেন বলেই ফিরোজ শাহ বেগমকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষমুহূর্তে তাঁরই এক দেহরক্ষীর জন্যে বেগমের প্রাণ রক্ষা পায়। বেগম অন্ধকার

রাত্রে পালিয়ে আসেন রাজধানী দেবগিরিতে। কিন্তু সেখানেও তিনি শান্তিতে বাস করতে পারেননি। তাঁকে কেন্দ্র করে আহম্মদ শাহ্ এবং রাজ্যের কয়েকজন আমীরের সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হয়। বেগম বুঝতে পেরেছিলেন স্বামীকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে এসেও তাঁর কোথাও শান্তি নেই। আহম্মদ শাহের রাজসিংহাসনের ওপর দুর্বলতা ছিল, ফিরোজ শাহের সম্পত্তির ওপর নয়। তাই বেগমের মুখে সব শুনেও তিনি ভাইকে আক্রমণ করার কোন চেষ্টাই করেননি। শুধু তাই নয়, রাজ্যের অন্য কেউ ফিরোজ শাহের সম্পত্তির লোভে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে তাও তিনি চাইতেন না। আর সেই কারণেই বেগমের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছিলেন, যাতে রাজ্যের অন্য কোন লোকের সঙ্গে তিনি দেখাসাক্ষাৎ করতে না পারেন।

অগত্যা নিরুপায় হয়ে বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পাবার আশায় বেগম আত্মহত্যা করার সংকল্প করেন। আত্মহত্যা করার আগে তিনি একটা শিলালিপিতে লিখে গেলেন স্বামীর ঠিকানা, তাঁর করুণ জীবনের ইতিহাস আর স্বামীর ঠিকানায় পৌঁছুবার জন্যে সাংকেতিক চিহ্ন সমেত একটা ম্যাপ।

তারপর তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। বেগমের বিশ্বস্ত অনুচরেরা বেগমের আদেশমত তাঁর মৃতদেহ রাজপ্রাসাদের বাইরে এক পরিত্যক্ত মাঠে বিনা আড়ম্বরে গোপনে সমাধি দিয়ে রাজধানী দেবগিরি পরিত্যাগ করে।

সুতরাং বেগমের শেষ পরিণতির কথা কেউ জানতে পারেনি। বেগমের শেষ অনুরোধ তাঁর অনুচরেরা রক্ষা করেছিল। তারা বেগম-লিখিত শিলালিপিটিও বেগমের মৃতদেহের সঙ্গে কবর দিয়ে দিয়েছিল।

* * * * *

যাই হোক শিলালিপির সাংকেতিক ভাষা উদ্ধার করতে পেরে রমাশঙ্কর চাটুয্যে আনন্দে দিশে হারিয়েছিলেন। তখুনি একটা চিঠি লিখে দিলেন তাঁর স্বর্গীয় ভ্রাতা শিবশঙ্করের একমাত্র পুত্রসন্তান মণিশঙ্করকে।

মণিশঙ্কর কলকাতায় ছিল।

চিঠি পেয়ে সে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে রওনা হয় দেবগিরির উদ্দেশে। ইতিমধ্যে দেবগিরিতে একটা ঘটনা ঘটে গেল যেটা রমাশঙ্কর একেবারেই কল্পনা করেননি।

হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে ভারত সরকারের মনোমালিন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছিল। নিজামের আচরণ ভারত সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। একটা মিটমাটের চেষ্টা করেও যখন ভারত সরকার সফল হলেন না, বরং নিজাম বিদ্রোহ

ঘোষণা করলেন তখন ভারত সরকার সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে হায়দ্রাবাদের দখল নিতে বাধ্য হলেন।

সেই টালবাহানার সুযোগ নিল সংগ্রাম সিং দেবরায়।

যে রাত্রে ভারতীয় বাহিনী হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করল সেই রাত্রেই সে রমাশঙ্কর চাটুয্যেকে অপহরণ করে নিয়ে গেল তার গোপন আস্তানায়।

রমাশঙ্কর রাগে ফেটে পড়লেন, কিন্তু তখন আর কোন উপায় ছিল না। সংগ্রাম সিংয়ের কবলে তিনি তখন বন্দী। তবু শেষ চেষ্টা করতে তিনি ছাড়েননি। সংগ্রাম সিংকে যাচ্ছেতাই করে গালমন্দ করে বললেন,—তুমি কি ভেবেছ আমাকে তুমি চিরকাল বন্দী করে রাখতে পারবে! ভাল চাও তো এখনও ছেড়ে দাও, নইলে—

সংগ্রাম সিং হেসে বললে,—আপনি অযথা আমার ওপর গোসা করছেন বাবুজী। ইণ্ডিয়ান আর্মি এখন হায়দ্রাবাদ দখল করার জন্যে তুমুল লড়াই করছে। এই সময় আপনার বাইরে থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে আপনি নিজামের লোক। আপনার পক্ষে বাইরে থাকা কোনমতেই উচিত নয়।

সংগ্রাম সিংয়ের কথা শুনে রমাশঙ্কর জ্বলে উঠেছিলেন।

—চুপ কর শয়তান, জোচ্চোর, নেমকহারাম! এই মুহূর্তে আমার পথ ছেড়ে দাঁড়াও।

—মিছে কেন চেঁচামেচি করছেন বাবুজী! ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথাগুলো বিবেচনা করে দেখুন—

—তুমি আমায় পথ ছেড়ে দেবে কি না জানতে চাই—

—পথ ছেড়ে দিতে এখুনি রাজী যদি আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী হন—

—কিসের প্রস্তাব—বল এখুনি বল—

—আমার কথা রাখবেন?

—আগে বল তোমার কি প্রস্তাব করার আছে।

—বেশ, তবে শুনুন বাবুজী। আমার আসল পরিচয় আপনাকে আগেই জানিয়েছি। আর কেন জানিয়েছি জানেন? বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের সম্পত্তি আমার চাই।

—তার মানে?

—মানেটা কি আরও পরিষ্কার করে বলতে হবে?

সংগ্রাম সিং গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখখানা থমথম করতে লাগল। সে বললে,—বাবুজী, আপনাকে সাফ কথা বলে দিচ্ছি। রত্নসিংহাসন আমার চাই। শিলালিপির সাংকেতিক ভাষা আপনি যখন উদ্ধার করতে পেরেছেন তখন আপনার সাহায্যেই রত্নসিংহাসন

ফিরে পেতে চাই। ওটা ভারত সরকারের সম্পত্তি নয়, ওটা আমার। আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন তবে সোজা কথা জেনে রাখুন বাবুজী, এখান থেকে জীবন নিয়ে কোনদিন ফিরে যেতে পারবেন না।

রমাশঙ্কর সেকথা শুনে রুখে উঠেছিলেন,—কি বললে, তুমি আমাকে খুন করবে?

—দরকার হলে খুন করতেও দ্বিধা করব না। রত্নসিংহাসন আমার চাই। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, কোনরকম চালাকি না করে যদি রত্নসিংহাসন আমার হাতে তুলে দেন তবে আমি আপনাকে দশ লক্ষ টাকা দেব। আমার মনে হয়, আপনার মত একজন গরীব বাঙ্গালীবাবুর পক্ষে একসঙ্গে দশ লক্ষ টাকা যথেষ্ট। কি বলেন?

ভীমাকৃতি একটা লোক এসে খাবার দিয়ে যেত। [পৃষ্ঠা ২৫০

এত দুঃখেও রমাশঙ্কর সেদিন হেসে উঠেছিলেন। হাসি থামতে বলেছিলেন,—সংগ্রাম সিং, এতক্ষণ তোমার ওপর আমার খুব রাগ হচ্ছিল। ভেবেছিলাম তুমি আমাকে জেনে শুনে কেন এতটা বাড়াবাড়ি করছ। কিন্তু এখন দেখছি তুমি আমার সম্বন্ধে কিছুই আন্দাজ করতে পারনি। দেখ, অর্থের প্রয়োজন সকলেরই আছে। আমারও আছে। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন পেটের জন্যে আমার অর্থের প্রয়োজন হবেই। এতে কিছুমাত্র ভুল নেই। কিন্তু অর্থের প্রতি তোমার যতটা লালসা আছে তার বিন্দুমাত্র আমার নেই। দশ লক্ষ কেন, দশ কোটি টাকা দিয়েও তুমি আমাকে কিনতে পারবে না। তাছাড়া আর একটা কথা বলি—আমি যে শিলালিপির ভাষা ঠিকমত পড়তে পেরেছি তারই বা ঠিক কি। এমনও তো হতে পারে বিন্ধ্য-পর্বতের যে গুহায় সুলতান ফিরোজ শাহ্ আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে মনে করছি সেই গুহাটা ভূকম্পনে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিংবা গুহাটা থাকলেও রত্নসিংহাসন সেখানে নেই।

সংগ্রাম সিংয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল। বললে,—আমায় যতটা মূর্খ মনে করেন ততটা মূর্খ আমি নই বাবুজী। এ ক'মাস আপনার সঙ্গে আমি ছায়ার মত ঘোরাফেরা করেছি। যেদিন আপনি সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করলেন সেদিন আপনার উত্তেজনা, আপনার আনন্দ দেখে সন্দেহ করার কিছু ছিল না। সেদিন আপনি স্বীকারও করেছিলেন। সুতরাং অন্য কথা বললে আমি বিশ্বাস করব না। রত্নসিংহাসন আমার চাই। আপনাকে পনের দিন সময় দিচ্ছি বাবুজী—এর মধ্যে যদি আপনি কাজ শুরু না করেন তবে আমার ডাক্তারবাবুকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। লোকটা পাগলা কুকুরের 'সিরাম' নিয়ে বেশ কিছুদিন হল রিসার্চ করছেন।

সংগ্রাম সিং হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রমাশঙ্কর নিষ্ফল আক্রোশে শুধু ফুলেছেন। অপরিসর অন্ধকার একটা ঘরে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। দিনের বেলায় ঘরে একটা মাত্র লণ্ঠন জ্বলত। সারাদিনে মাত্র দুবার ভীমাকৃতি একটা লোক এসে খাবার দিয়ে যেত। রমাশঙ্কর প্রথম প্রথম খাবার মুখে তুলতেন না যে লোকটা খাবার দিতে আসত তাকে গালমন্দ করতেন। লোকটা বোধহয় বোবা আর কালা। নইলে অত গালমন্দ শুনেও টুঁ শব্দটি করত না, নির্বিবাদে নিজের কাজ করে চলে যেত।

সন্ধ্যে হলেই রমাশঙ্কর বুঝতে পারতেন সংগ্রাম সিং দলবল নিয়ে গোপন আড্ডায় এসেছে। যে ঘরে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেটা যে মাটির নীচের একটা ঘর, সেটা ’দিন পরেই রমাশঙ্কর বুঝতে পারেন।

অগত্যা নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই জেনেই রমাশঙ্কর খাবার ফেরত পাঠাতেন না। কিন্তু তা হলে কি হবে, আবছা অন্ধকার তাঁর সহ্য হত না। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর অন্ধকার যেন তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছিল।

বিশেষ করে মাটির নীচের ঘর বলেই হিমশীতল ঠাণ্ডায় হাত পা কেমন যেন অবশ হয়ে যায়। অমন যে স্থির অচঞ্চল মন তাও যেন বিকল হয়ে যাবার উপক্রম হয়।

সংগ্রাম সিং আসে যায় কিন্তু কখনও দেখা করে না। ওর বিকট হাসির রেশ মাঝে মাঝে ভেসে আসে মাত্র।

রমাশঙ্করবাবুর মাঝে মাঝে চীৎকার করতে ইচ্ছে হত। প্রথম প্রথম চীৎকার করেছেনও কিন্তু কোন ফল হয়নি। শেষে তিনি ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলেন।

*　　*　　*

এদিকে চিঠি পেয়ে রমাশঙ্করের ভাইপো মণিশঙ্কর হায়দ্রাবাদে এসে পৌঁছাল। মণিশঙ্কর যুবক। বয়স প্রায় তিরিশ বত্রিশ হবে। সুঠাম বলিষ্ঠ গড়ন।

ঐ সময় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী হায়দ্রাবাদ দখল করে নিয়েছে। সেই কারণে দু'দিনের পথ অতিক্রম করতে লাগল সাত দিন।

দেবগিরি থেকে রমাশঙ্করবাবু চিঠি দিয়েছিলেন। তাই দেবগিরিতে তাঁর সাক্ষাৎ না পেয়ে মণিশঙ্কর খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়েছিল। রমাশঙ্করবাবুর অনেকদিনের পুরনো ভৃত্য সমরু বললে,—রোজকার মত সেদিনও রাত্রে বাবু খেয়েদেয়ে শুয়েছিলেন। ঘরের দরজা খোলাই থাকে। ভোর রাত্রে বাবুর চা খাওয়া অভ্যাস তাই আমি রাত থাকতে চা নিয়ে যেতাম। বাবু চা খেয়ে আবার শুয়ে পড়তেন। সেদিন চা নিয়ে গিয়ে দেখি বাবু বিছানায় নেই। ভাবলাম বুঝি গোসলখানায় গেছেন। কিছুক্ষণ পরে গোসলখানায় গিয়ে দেখি বাবু নেই। কোথায় গেছেন তাও জানি না। কি করি ভেবে না পেয়ে শেষে এখানকার থানার বড়বাবুকে সব কথা খুলে বললাম। দেশে এখন খুবই গণ্ডগোল হচ্ছে। সেই কারণে থানার বড়বাবু আসতে পারলেন না। বললেন, জলজ্যান্ত একটা লোক বিছানা থেকে তো উপে যেতে পারে না। দেখগে তোমার বাবু বোধহয় রাতারাতি নিজাম প্যালেসে ফিরে গেছেন। থানা থেকে ফিরে এসে আজ সাত দিন হল আমি ঘর আগলে পড়ে আছি কিন্তু বাবুর দেখা পাইনি। কোথায় গেছেন, কেমন আছেন কিছুই জানি না।

মণিশঙ্কর শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল,—কাকামণির কোন খবর সাত দিন পাসনি?

সমরু বললে,—না বাবু।

—কাকামণির বন্ধুবান্ধব কেউ থাকে এখানে?

—থাকে। সে লোকটা বন্ধু নয় তবে রোজ সকালে বিকেলে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসত।

—কি নাম?

—সংগ্রাম সিং দেবরায়। লোকটা এখানকার একজন নামকরা কণ্ট্রাক্টর।

—তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর বাড়ি কোথায় জানি না। কাল হঠাৎ বাজারে দেখা হয়ে গেল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি তো আমাকে তেড়ে মারতে এলেন। বললেন,—তোর বাবুকে আমি চিনি না, আমি কি করে জানব তিনি কোথায়?

—তার মানে?

—কি জানি বাবু। যে লোকটা রোজ দু'বেলা বাবুর কাছে আসত সে কেন বাবুর নাম শুনে তেড়ে মারতে এল বুঝলাম না।

সমরু কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে,—সংগ্রাম সিং লোকটা ভাল নয় দাবাবু—

—কি করে বুঝলি ?

—বাবু একদিন আমাকে বলেছিলেন—সমরু, এই সংগ্রাম সিং লোকটাকে চিনে রাখিস। আমার অনুপস্থিতিতে লোকটা যদি কখন এবাড়িতে এসে কিছু চায় কিংবা আমার ঘরে বসতে চায় তবে খবরদার চোখের আড়ালে যাবি না। আমাকে জিজ্ঞাসা না করে ওকে কিছু দিবি না, এমন কি আমার চিঠি পেলেও দিবি না। কথাটা মনে রাখিস।

—কাকামণি কেন একথা বলেছিলেন জানিস ?

মণিশঙ্কর প্রশ্ন করতে সমরু আরও কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে,—সংগ্রাম সিং লোকটা বোধহয় খুব লোভী। বাবু প্রায় সংগ্রাম সিংকে এই নিয়ে গালমন্দ করতেন।

. চিঠিটা বের করে পড়তে লাগল !

—কাকামণি তোকে কিছু বলেছেন কি ?

—না দাদাবাবু, আমাকে কিছুই বলেননি।

একথায় মণিশঙ্করের শঙ্কা বাড়ল বই কমল না। কোথায় যেতে পারেন ? কেন গেলেন ? হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে উধাও হওয়ার কারণই বা কি ? কিছুই ভেবে পায় না মণিশঙ্কর। রমাশঙ্করবাবুর ঘর আতিপাতি করে খুঁজল সে। আশ্চর্য, রাত্রিবাস ছাড়া আর সবই তো রয়েছে। এমন কি তিনি পায়ের স্যাণ্ডেলটাও নিয়ে যাননি। রিস্টওয়াচ, ফাউনটেন পেন, এমন কি চশমাটাও রয়েছে।

তবে কি তাঁকে কেউ ঘুমন্ত অবস্থায় কিডন্যাপ করেছে ? কথাটা মনে হতে মণিশঙ্করের মেরুদণ্ড বেয়ে হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল।

কিন্তু কেন কিডন্যাপ করল ? ঘরে টাকাপয়সা, সোনার বোতাম সবই রয়েছে, কিছুই খোয়া যায়নি। তবে কেন কিডন্যাপ করল ?

মণিশঙ্করের হঠাৎ মনে পড়ে রমাশঙ্করবাবুর চিঠির কথা। চিঠিটা সঙ্গেই ছিল। তাড়াতাড়ি সে স্যুটকেস থেকে চিঠিটা বের করে পড়তে লাগল। রমাশঙ্করবাবু এক-জায়গায় লিখেছেন……রত্নসিংহাসনের কথা ইতিহাসে নেই। পর্যটক নিকিতিনের বিবরণে আছে। আর সুলতান ফিরোজ শাহের প্রধানা বেগমের কবর খুঁড়ে মৃতদেহের (কঙ্কালের ফসিল) সঙ্গে যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতে লেখা আছে। সুতরাং এসব কথা কাউকে বল না। বললে আমারই বিপদ্ হবে। রত্নসিংহাসনের মূল্য কয়েক কোটি টাকা। মানুষ টাকার লোভে দুনিয়ায় এমন কোন কাজ নেই যা করতে পারে না। মনে রাখবে রত্নসিংহাসন যদি সত্যিই পাওয়া যায় তবে ওটা হবে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। সেইজন্যে আমি চাই, চিঠি পাওয়ামাত্র দু'মাসের ছুটি নিয়ে তুমি চলে আসবে। ঘুণাক্ষরেও কোন লোককে কোন কথা বলবে না। একা চলে আসবে।… ইত্যাদি।

চিঠিটা পড়ে একটা কালো পর্দা যেন মণিশঙ্করের চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

* * * * *

(ক্রমশঃ)

---

২৪২ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

১। টেবিল ল্যাম্পের গায়ে আঁকা তিনটি স্টার নেই

২। মেয়েটির গলায় টাই নেই

৩। জানালার পর্দায় একটা ছাপ নেই

৪। খবরের কাগজে দুটি পাতা নেই

৫। লোকটির কোটে কিছুটায় ছাপ নেই

৬। মেয়েটির কোমরে বেল্ট নেই

৭। টেবিল ল্যাম্পের নীচের ধারটার স্ট্রাইপ নেই।

দেবাগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩

—সমরু সমরু—

মণিশঙ্করের ডাক শুনে সমরু ছুটে এল।

—কি বলছেন দাদাবাবু ?

—হ্যাঁরে, কাকামণির কাছে সংগ্রাম সিং কেন আসত জানিস ?

সমরু বোকার মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে,—হ্যাঁ, কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। কোন্ কবর খুঁড়ে যে পাথরটা পাওয়া গিয়েছিল সেইটের সম্বন্ধে লোকটা বাবুকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত। বাবু রেগে যেতেন। একদিন তো রেগেমেগে বললেন—তুমি মুখ্যু মানুষ এসবের মর্ম কি বুঝবে !

—একথা বলেছিল ?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, আমি নিজের কানে শুনেছি। আমি তখন বাবুকে চা দিতে এসেছিলুম কিনা।

—তাহলে আর দেখতে হবে না—কাকামণিকে ঐ ব্যাটাই কিডন্যাপ করেছে।

সমরু কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল,—কি করেছে বললেন ?

—কিডন্যাপ—কিডন্যাপ করেছে। মানে অপহরণ করেছে—

সমরুর থুতনি ঝুলে গেল। অবাক্ বিস্ময়ে মণিশঙ্করের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে,—আপনি কি বলছেন দাদাবাবু, আমার বাবুকে ঐ ব্যাটা মাতাল লোকটা গায়েব করেছে !

—আমার তাই মনে হয়। রত্নসিংহাসন পাওয়ার লোভে হয়তো কাকামণিকে কোথাও আটকে রেখেছে।

সমরুর চোখের তারা নেচে ওঠে। মণিশঙ্করের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললে,—আপনি ঠিকই বলেছেন বাবু, একদিন ঐ লোকটা বাবুকে সিংহাসনের কথা বলছিল বটে। আমি নিজের কানে শুনেছি। তারপর, তারপর—

সমরুর চোখে মুখে আতঙ্কের রেখাগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠল। গলার স্বর নামিয়ে গোপন কথা বলার মত করে বললে,—জানেন দাদাবাবু, বাবুর খোঁজে আমি যখন ইদিক-উদিক ছোটাছুটি করছি আর ভাবছি সেই সময় আমাদের বাড়ির সামনে যে মুদির দোকানটা আছে তার মালিক আমাকে ডেকে বললে, যেদিন থেকে বাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না তার আগের দিন মাঝরাতে সে নাকি সংগ্রাম সিংকে কয়েকজন লোক নিয়ে আমাদের বাড়ির কাছেপিঠে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে।

—একথা পুলিসকে বলেছিস ?

—না দাদাবাবু। থানার বড়বাবু আমার কথা গেরাহ্যি করে না।. তাছাড়া—

—তাছাড়া কি ?

—বাবু চলে যাওয়ার পর থেকেই কয়েকটা ষণ্ডাগুণ্ডা লোক বাড়ির দরজার কাছে রোজই ঘোরাফেরা করছে। লোকগুলোর মতলব বোধহয় ভাল নয়। একদিন আমাকে ডেকে বললে, দেখ বাপু, থানায় বেশী যাতায়াত করলে ভাল হবে না। প্রাণে যদি বাঁচতে চাও তবে মানে মানে হায়দ্রাবাদ ছেড়ে পালাও।

—কথা নেই বার্তা নেই লোকগুলো তোকে শাসাতে গেল কেন ?

—কি জানি বাবু, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে। প্রাণ নিয়ে কোনরকমে বেঁচে আছি। রাতের অন্ধকার নামলেই বুক টিপটিপ করে। সব সময় মনে হয় এই বুঝি কেউ এসে টুঁটি টিপে ধরল। আমি যে কি করে রাত কাটাচ্ছি তা একমাত্র ভগবান্ জানেন।

মণিশঙ্কর সাহসী যুবক হলেও সমরুর মুখ থেকে আদ্যোপান্ত শুনে খুবই দমে গেল। এখন তার কি করা কর্তব্য ? দেশের পরিস্থিতি তখন গোলমেলে। থানা পুলিসের ওপর কোন ভরসা নেই। দেশের আইনকানুন তখন ভারতীয় সৈন্যের কবলে। গোটা দেশে মার্শাল ল।

এ অবস্থায় কি করা উচিত ভেবে পেল না মণিশঙ্কর। তবু দুপুরের দিকে সে একবার থানায় গেল। যাবার সময় সমরুকে কিছুই বলে গেল না। কেন জানি না সমরুকে সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না। সমরু অনেকদিনের ভৃত্য। ওর পুরো নাম সমর জানা। কণ্টাইয়ের দিকে বাড়ি। রমাশঙ্করবাবু ওকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। খুব বিশ্বাসী। তবু ওকে মণিশঙ্কর বিশ্বাস করতে পারছিল না।

সমরুকে কিছু না জানিয়ে থানায় গেল। থানা অফিসার তখন খুব ব্যস্ত। একজন ভারতীয় মিলিটারী অফিসারকে তিনি তাঁর এলাকার ম্যাপ দেখিয়ে খুঁটিয়েনাটিয়ে পথঘাট, বসতি আর লোকসংখ্যা সম্বন্ধে বলে যাচ্ছিলেন। মণিশঙ্করের অভিযোগ শোনার সময় তাঁর ছিল না। একজন পুলিস ইন্সপেক্টর মণিশঙ্করের কথা শুনে বললেন,—দেশের যা অবস্থা তাতে বর্তমানে আপনাকে কোনরকম সাহায্য করা আমাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না।

কোনরকম সাহায্য করা আমাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না।

—কিন্তু এসময় আপনারা আমাকে একটু সাহায্য না করলে আমি কি করে কাকামণির সন্ধান পেতে পারি ! আমার সন্দেহ হচ্ছে দুষ্টপ্রকৃতির কোন লোক আমার কাকাকে কিডন্যাপ করেছে।

—সেরকম কিছু প্রমাণ পেয়েছেন নাকি ?

—প্রমাণ কিছু দিতে পারবো না তবে কিছুটা আইডিয়া করা যায়। মানে পরোক্ষ ক্লু ধরে পুলিস যদি এগোয় তাহলে হয়তো সন্ধান পেতে পারি।

ইন্সপেক্টর একটু হেসে বললেন,—এভাবে কাজ করা আমাদের পক্ষে বর্তমানে সম্ভব হবে না। আপনি বরং ভারতীয় মিলিটারী অফিসারের কাছে আপনার অভিযোগ লিখিতভাবে পেশ করুন। তাঁরা আমাদের হুকুম দিলে তবে আমরা এগোতে পারব। আর তা যদি না পারেন তবে মাসখানেক অপেক্ষা করুন। এদিকের ঝঞ্ঝাট মিটলে দেখা যাবে।

অগত্যা মণিশঙ্কর হতাশ হয়ে ফিরে এল। বাড়ি ফিরে এসে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির

করতে বসল। একমাত্র এলোমেলো চিন্তা ছাড়া তার করার কিছুই ছিল না। পুলিস ইন্সপেক্টর প্রমাণ চাইলেন। তা না হলে সংগ্রাম সিংকে শুধুমাত্র সন্দেহ করে কোন ফল হবে না। সংগ্রাম সিং যে রমাশঙ্করবাবুকে কিডন্যাপ করেছে তার প্রমাণ কই—

হঠাৎ মণিশঙ্করের মনে পড়ল তার কাকামণির চিরকালের অভ্যাস ছিল দৈনন্দিন ডায়ারী লেখা।

কথাটা মনে হতেই সে কাকামণির ঘরে গিয়ে ডায়ারী খুঁজতে খুঁজতে সেটা দেওয়াল আলমারির মধ্যেই পেয়ে গেল। ডায়ারীটা অমূল্য সম্পদ্ মনে করে দরজায় খিল এঁটে পড়তে বসল।

আট দিন আগের রাত্রের তারিখে তিনি লিখেছেন অনেক কথা। মণিশঙ্কর মনে মনে পড়তে লাগল। লেখা আছে…

আমার মনে হচ্ছে ঝোঁকের মাথায় সংগ্রাম সিং দেবরায়কে রত্নসিংহাসনের কথাটা আমার বলা উচিত হয়নি। লোকটা লোভী। অর্থের জন্যে এমন কাজ নেই যা সে করতে পারে না। তাছাড়া সে যখন আগে থেকেই রত্নসিংহাসনের ওপর দাবি জানাচ্ছে তখন ওকে শিলালিপিতে খোদাই করা ম্যাপের কথাটা জানিয়ে বোধহয় ভাল করলাম না। সংগ্রাম সিংয়ের দলে রয়েছে হায়দ্রাবাদের সেরা গুণ্ডারা। এখানকার পুলিসকে টাকা ঘুষ দিয়ে বশ করেছে। তার এতদূর স্পর্ধা যে মহামান্য নিজাম বাহাদুরকেও সে পরোয়া করে না। সুলতান ফিরোজ শাহের বেগমের কবর খুঁড়ে সে অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকার হীরে জহরত পেয়েছে। তার প্রমাণ আমি দিতে পারি। হীরে জহরতগুলো সে কার কাছে বিক্রি করেছে তাও আমি জানি। সুতরাং এহেন চরিত্রের লোককে বিশ্বাস করে রত্নসিংহাসন খুঁজতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমি জানি সংগ্রাম সিং কেন দু'বেলা আমার কাছে যাতায়াত করছে। যেদিন ম্যাপের কাজ শেষ করব সেইদিন থেকেই ও আমার প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় ম্যাপটার কথা ওকে না জানানই ভাল। মণিশঙ্করকে আসতে লিখেছি। মণি এলে ওর সঙ্গে আলোচনা করে কাউকে কিছু না বলে একদিন দুজনে বেরিয়ে পড়ব বিন্ধ্যপর্বতের কোলে। মণিশঙ্কর যদি ওর বন্ধুবান্ধবের কাউকে বুদ্ধি করে নিয়ে আসে তাহলে কাজের সুবিধে হয়। আমি চাই উৎসাহী, কর্মঠ আর সাহসী যুবক।……ইত্যাদি

মণিশঙ্কর তার কাকামণির ডায়ারী পড়ে আরও হতাশ হয়ে পড়ল। এইতো কাকামণিও সংগ্রাম সিংকে সন্দেহ করেছেন। রত্নসিংহাসনের ওপর সে আগে থেকেই দাবি জানিয়ে রেখেছে।

নিশ্চয়ই সংগ্রাম সিং কাকামণিকে কিডন্যাপ করেছে। মুদির দোকানের মালিক সংগ্রাম সিংকে দলবল নিয়ে মাঝরাতে কাকামণির বাড়ির কাছেপিঠে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে।

এটা প্রমাণ ছাড়া আবার কি? কিন্তু পুলিস তো মানতে চাইবে না। কারণ সংগ্রাম সিং পুলিসের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। তাহলে উপায়—

* * *

বহু চিন্তার পরে সে উপায় খুঁজে পেল। তার একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয় জেনেই সে তার বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী সুরেশ ভৌমিককে তার বিপদের কথা আদ্যোপান্ত জানিয়ে একটা চিঠি লিখল।

সুরেশ ভৌমিকের একটা পরিচয় আছে। কিছুদিন আগে সে প্রফেসর ত্রিদিব সেনের সঙ্গে অভিশপ্ত বুদ্ধ মূর্তি * উদ্ধার করতে হিমালয়ে গিয়েছিল।

প্রফেসর ত্রিদিব সেন একজন প্রত্নতাত্ত্বিক। সুরেশকে চিঠি দিলে সে নিশ্চয় তাঁকে ঐতিহাসিক রত্নসিংহাসনের কথা জানাবে। প্রফেসর ত্রিদিব সেন অসমসাহসী মানুষ। সুরেশের কাছে তার কাকামণির বিপদের কথা শুনে কিছুতেই তিনি চুপ করে বসে থাকবেন না। তাঁর সাহায্য নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

চারদিক ভেবেচিন্তে মণিশঙ্কর সেই রাত্রেই সুরেশকে চিঠি লিখে ফেলল।

* * *

কিন্তু প্রশ্ন হল, চিঠি পোস্ট করলে যথাসময়ে সুরেশ ভৌমিক তা পাবে কি না। কারণ আগেই বলেছি তখন হায়দ্রাবাদে ভারতীয় ফৌজ ঢুকে পড়েছে। নিজামের শাসন তখন বানচাল হয়ে গেছে। ফলে, দেশের সমস্ত সরকারী অফিস বন্ধ। ডাক ও তার বিভাগের কাজও অনিয়মিতভাবে চলছে। ট্রেন চলাচল ঠিকমত হচ্ছে না। কেবলমাত্র আকাশপথে মিলিটারীর সাহায্যে বাঙ্গালোর পর্যন্ত যাতায়াত করা সম্ভব হচ্ছিল।

অগত্যা পরের দিন সকালে মণিশঙ্কর বাঙ্গালোর যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সমরুকে বললে,—কাকামণির কোন খোঁজ তো পেলাম না। দু'একদিনের জন্যে আমি বাঙ্গালোরে যাচ্ছি। ফিরে এসে যা হয় একটা কিছু করব। আপাততঃ তুই বাড়ি ছেড়ে যাস না। বলা যায় না কাকামণি হঠাৎ ফিরে আসতেও পারেন।

সমরু কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মণিশঙ্কর আসাতে সে একটু চাঙ্গা হয়েছিল। ভেবেছিল মণিশঙ্কর থাকলে তার প্রাণের আশঙ্কা নেই। তা যখন হল না তখন

* ১৯৬৫ সালের শুকতারায় প্রকাশিত 'অভিশপ্ত মূর্তি' পড়লে প্রফেসর ত্রিদিব সেন আর সুরেশ ভৌমিকের পরিচয় পাওয়া যাবে।

সে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে বললে,—দাদাবাবু, আপনি চলে গেলে আমার পক্ষে একা এ বাড়িতে থাকা সম্ভব হবে না।

মণিশঙ্কর বিরক্ত হয়। বললে, —কেন, তোকে কি কেউ মেরে ফেলবে!

সমরু কাঁচুমাচু হয়ে বললে,—দিনকাল ভাল নয় বাবু! কেউ যদি গায়ের জোরে বাড়িতে ঢোকে তখন চেঁচামেচি করলেও কেউ আমায় রক্ষা করতে আসবে না। তাই বলছিলাম, এসময়ে আপনি কোথাও যাবেন না।

—বাঙ্গালোরে আমার কাজ আছে। যাব আর আসব। তোর কোন ভয় নেই।

মণিশঙ্কর সমরুর কথায় আমল না দিয়ে চলে গেল। একটা মুহূর্ত নষ্ট করার মত সময় তার ছিল না। বাঙ্গালোর থেকে আজই তাকে চিঠিটা পাঠাতে হবে। সুরেশ না আসা পর্যন্ত বাঙ্গালোর থেকে ফিরবে না।

* * *

ওদিকে রমাশঙ্করবাবুর চিন্তার অন্ত ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন সংগ্রাম সিংয়ের কথামত না চললে তাঁর মুক্তির কোন আশা নেই। সংগ্রাম সিংয়ের দলের ঐ ডাক্তারটা পয়লা নম্বরের শয়তান। যেমন ওর কুৎসিত চেহারা তেমনি নিষ্ঠুর চরিত্র।

সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তারকে নিয়ে এসেছিল সংগ্রাম সিং।

প্রথম পরিচয়ে ডাক্তার কুৎসিত হাসি হেসে বলেছিল, সংগ্রাম সিং যা বলছে তা পোষা কুকুরের মত মেনে চলুন মশাই নইলে আমাকে আবার নরকের দরজাটা খুলতে হবে। আপনি শিক্ষিত লোক, পাগলা কুকুরের সীরাম যে কত ভয়ংকর বস্তু তা নিশ্চয় জানেন।

ডাক্তার তার ব্যাগের ভেতর থেকে সীরামের একটা অ্যাম্পুল বের করে হাসতে হাসতে অতি সহজভাবে বললে,—শুনলাম আপনার ভাইপো মণিশঙ্কর আপনার খোঁজে দেবগিরিতে এসেছে। আর আপনার খোঁজ না পেয়ে সংগ্রাম সিংয়ের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরী করতে গিয়েছিল।

ডাক্তার হাসল।

বলতে লাগল,—খুব সেয়ানা ছেলে। সমরুর কাছে দু'চারটে কথা শুনেই ঠিক ধারণা করে নিয়েছে সংগ্রাম সিং আপনাকে কিডন্যাপ্ করেছে।

মণিশঙ্কর এসেছে শুনে রমাশঙ্করবাবু মনের উত্তেজনা গোপন করতে পারলেন না। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন,—মণি এসেছে?

—আজ্ঞে। আর এসেই আমাদের পিছনে লেগেছে। তাই সংগ্রামকে বলছিলাম, আজ রাত্রেই মণিশঙ্করকে ওয়ান সিসি সীরাম উপহার দিলেই—

ডাক্তারের মুখখানা পৈশাচিক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রমাশঙ্করবাবু নিজের

জীবনের পরোয়া কোনদিনই করেন না। কিন্তু তাঁর জন্যে অন্য কারও, বিশেষ করে একমাত্র ভাইপোর জীবন নষ্ট হবে তা তিনি কোনমতে বরদাস্ত করতে পারলেন না। প্রতিবাদ করে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন,—খবরদার বলছি মণিশঙ্করের কোন ক্ষতি তোমরা কোর না। তা যদি কর, তবে রত্নসিংহাসনের হদিস তোমাদের দেব না। আমি হাসতে হাসতে আত্মহত্যা করব, তোমাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করব তবু রত্নসিংহাসনের হদিস কখনই দেব না।

ব্যাগের ভেতর থেকে সীরামের একটা অ্যাম্পুল বের করে…
[পৃষ্ঠা ৩৭৬
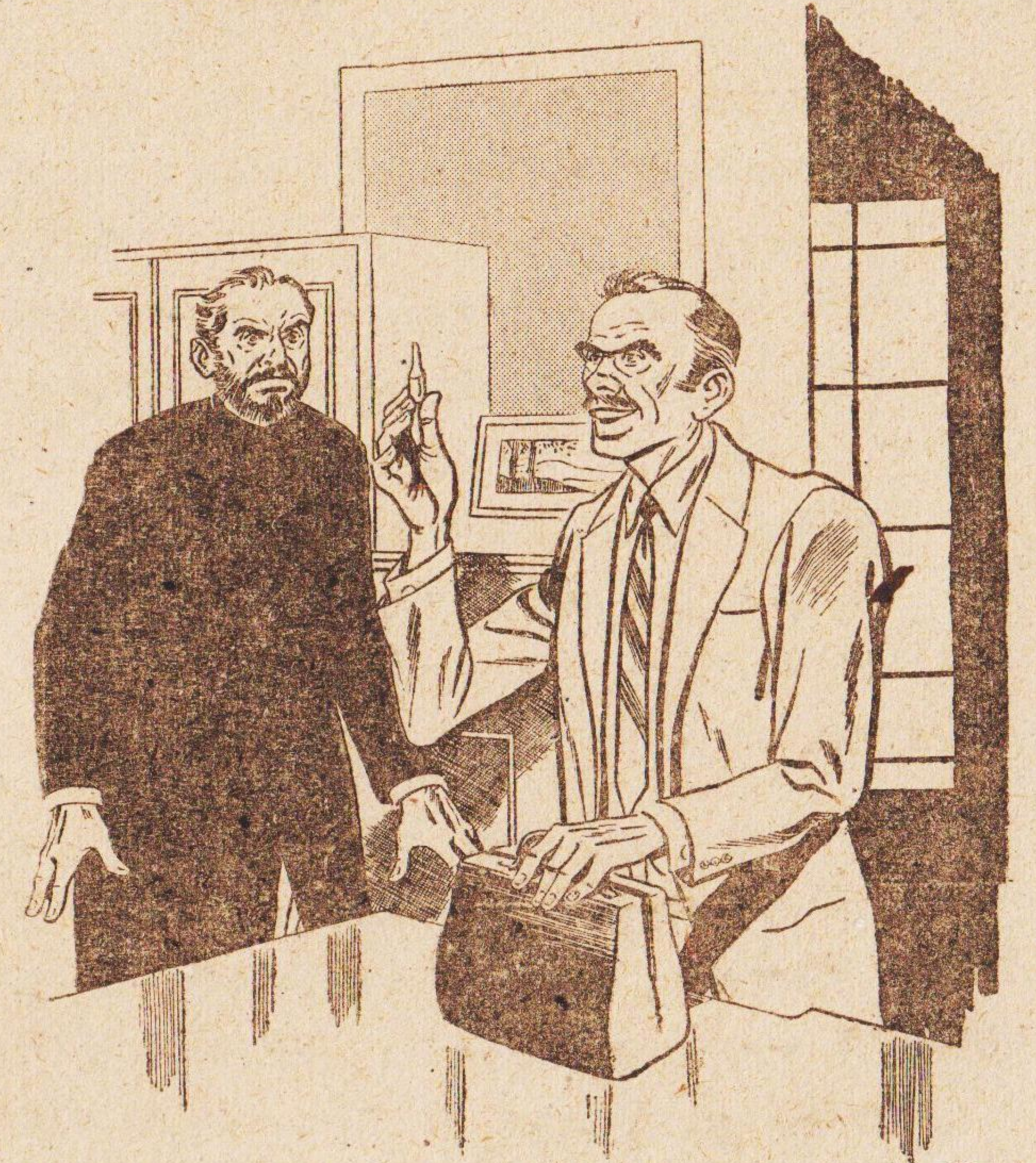
একথা শুনে ডাক্তার আর সংগ্রাম সিং চোখে চোখ রেখে জয়ের হাসি হাসল। ডাক্তার লোকটা হাসতে হাসতে বললে,—সংগ্রাম ঠিকই বলেছে। আপনি দেখছি আপনার ভাইপোকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। থাকগে যাক, আপনি যদি আমাদের সাহায্য করতে রাজী থাকেন তবে আপনার ভাইপোকে নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। কি বল হে সংগ্রাম—

সংগ্রাম সিং অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বিনীতভাবে রমাশঙ্করবাবুকে বললে,—বাবুজী, আমি আপনার শত্রু নই। আমার মনের অবস্থা যদি বুঝতেন তাহলে কখনই আমাকে ভুল বুঝতেন না। সেদিন রাত্রে আপনাকে যদি বাড়ি থেকে তুলে না আনতাম তবে আপনাদের মহামান্য নিজাম বাহাদুর আপনার জীবন খতম করে দিতেন। রত্নসিংহাসন উদ্ধার করে সেটাকে আর জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করতে হত না। নিজাম স্বয়ং রত্নসিংহাসন অধিকার করতেন। সেইজন্যে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না বলেই আপনাকে এখানে এই পরিবেশে আটকে রেখেছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন বাবুজী। আসুন

আজ এইক্ষণ থেকে সমস্ত ভুলে গিয়ে আমরা হাত মেলাই। দশ লক্ষের জায়গায় আমি আপনাকে পনের লক্ষ টাকা দেব। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি প্রবঞ্চক নই। অগ্রিম হিসেবে আপনাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে রাজী আছি। তবে হ্যাঁ, আমার একটা শর্ত আপনাকে পালন করতে হবে। যতদিন না রত্নসিংহাসন আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন ততদিন আপনি বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না, আমি অথবা আমার দলের লোক ছাড়া দ্বিতীয় কোন লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ দূরের কথা, কথা পর্যন্ত বলতে পারবেন না। আপনার থাকা খাওয়া সুবিধে অসুবিধে সবই দেখাশোনা করব। অবশ্য আপনার চাকর সমরু আপনার সঙ্গে থাকবে। তাকে কাল রাত্রে আমি নিয়েও এসেছি। কোন দিক দিয়েই আপনার অসুবিধে রাখিনি। এখন দয়া করে আপনি রাজী হলেই হয়।

দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে সংগ্রাম সিং থামল। রমাশঙ্করবাবু মনে মনে হাসলেন। ক'দিন আগেও তিনি মনে যা ভেবেছেন মুখে অকপটে তা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ ক'দিন অন্ধকার ঘরে বন্দী অবস্থায় থেকে নিজেকে কেবলই ধিক্কার দিয়েছেন। বন্যের সাথে বন্য সাজতে হয় নইলে জীবন ব্যর্থ। কথাটা শুধুই কেতাবী নয়, এর প্রতিটি কথা সত্য। সংগ্রাম সিং ধূর্ত, শয়তান, নরপিশাচ—তার সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে তাঁকেও ধূর্ত হতে হবে, সুযোগ বুঝে শয়তানি করতে হবে নইলে তাঁর মুক্তি নেই। তাই সেদিনের সুযোগ হেলায় হারাতে চাইলেন না। সংগ্রাম সিং থামতে তিনি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,—মহামান্য নিজাম বাহাদুর যে রত্নসিংহাসনের লোভে আমাকে বিপাকে ফেলতে পারেন তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম তাই শিলালিপির সাংকেতিক ভাষার কথা তাঁকে ঘুণাক্ষরেও জানাইনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বোধহয় অনবধানতা বশতঃ তিনি জেনে ফেলেছিলেন। আর সেইজন্যে আমাকে সরিয়ে ফেলতে চান। যাই হোক, তুমি যে আমার বন্ধু হিতাকাঙ্ক্ষী সেকথা যদি আমাকে আগে জানাতে তাহলে কখনই তোমাকে ভুল বুঝতাম না। তেলা মাথায় তেল দিতে আমি কোনদিনই ভালবাসি না। নিজাম বাহাদুরের চেয়ে রত্নসিংহাসন তোমার অধিকারে যাওয়া অনেক ভাল। তাছাড়া ওটার ওপর তোমার যখন বংশানুক্রমিক অধিকার আছে তখন বলার কিছু থাকতে পারে না। সংগ্রাম সিং, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী। আমার দিক দিয়ে কথায় খেলাপ হবে না কিন্তু কথা দাও এরপর তুমি ভুলেও কোনদিন আমাকে অবিশ্বাস করবে না। যদি তা কর তবে আমি আত্মঘাতী হব। তুমি বেশ ভাল করেই জান নিজের জীবনের ওপর মায়ামমতা আমার কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। আর এটাও ঠিক, আমি আত্মঘাতী হলে রত্নসিংহাসন উদ্ধার করার সাধ্য ভারতবর্ষে কারও নেই। কারণ শিলালিপিতে যা লেখা ছিল সেটা মনে গেঁথে

নিয়ে শিলালিপিটা নষ্ট করে দিয়েছি, যাতে সেটার ভাষা আর কেউ কোনদিন উদ্ধার না করতে পারে। অবশ্য তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই যে নিজাম বাহাদুরের শত্রুতার আশঙ্কায় কাজটা করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম।

সংগ্রাম সিং ডাক্তারের দিকে তাকাল। ওদের চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। পরক্ষণে সংগ্রাম সিং এগিয়ে এসে রমাশঙ্করবাবুর সঙ্গে করমর্দন করে হাসতে হাসতে বললে,—সেটা আমি জানি বাবুজী তাই ভবিষ্যতে আপনাকে কোনদিন অবিশ্বাস করব না। আজ থেকে আমরা বন্ধু—

দুজনের সন্ধি হয়ে গেল। (ক্রমশঃ)

বাঁকুড়া জেলার ভিটা নিবাসী শ্রীমতী তুলসীরানী যশ তাঁর স্বর্গগতা কন্যা মঞ্জুশ্রী যশের পুণ্যস্মৃতি-রক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺মঞ্জুশ্রী যশ স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু

"বাঙালী কোন্ পথে" অবলম্বনে একটি রচনা

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ: ৩১শে শ্রাবণ ১৩৭৮।

প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

জন্ম: ২১শে ভাদ্র ১৩৫৭
মৃত্যু: ১৬ই ফাল্গুন ১৩৭৬

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲ টাকা**

দেবগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

৪

সন্ধির পরে সংগ্রাম সিং রমাশঙ্করবাবুকে দেবগিরি শহরের বাইরে পাহাড়তলিতে সদ্য-নির্মিত দোতলা একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল।

বাড়িটার পরিবেশ নির্জন। ওদিকটা বড়-একটা কেউ যায় না।

বাড়িতে মোট ঘর ছখানা। প্রত্যেকটি ঘর বেশ বড়। প্রচুর আলো-বাতাসে পরিপূর্ণ। ঘরে আসবাবপত্রের অভাব ছিল না।

বাড়ির চারপাশে ঘেরা ফুলের বাগান। থরে থরে ফুল ফুটে আছে বাগানে।

প্রথম দর্শনেই ভাল লাগে।

সংগ্রাম সিং বললে,—এইখানে আপনি থাকবেন। থাকা খাওয়া আর ঘোরাফেরার কোন অসুবিধে হবে না আপনার। নীচের তলায় আমার দুজন লোক আছে। তাদের আপনি অতন্দ্র প্রহরী বলতে পারেন। অবশ্য তারা আপনাকে একেবারেই বিরক্ত করবে না। ওদের কাজ হচ্ছে আপনাকে রক্ষা করা।

রমাশঙ্করবাবু প্রতিবাদ করলেন না, বরং চোখে মুখে খুশির ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন,—তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে আর ছোট করব না।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে দোতলায় গিয়ে রমাশঙ্করবাবু সমরুকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন।

—একি রে তুই এখানে কি করে এলি ?

সমরু উত্তর দেবার আগে সংগ্রাম সিং হাসতে হাসতে বললে,—ওকে কাল রাত্রে আমার

লোকেরা নিয়ে এসেছে। আপনার যাতে কোনরকম অসুবিধে না হয় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। আসুন বাবুজী আপনার বেডরুমে গিয়ে বসা যাক। আর মিনিট পনেরর মধ্যে আমি বিদায় নেব। হায়দ্রাবাদের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আসুন—

বেডরুমে আরও একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ঘরে পা দিয়েই রমাশঙ্করবাবু দেখতে পেলেন সুদৃশ্য বিছানার পাশে ছোট একটা সাইড টেবিলের ওপর থরে থরে একশো টাকার ভারতীয় কারেন্সি নোট সাজান রয়েছে। সেগুলো দেখে রমাশঙ্করবাবু সংগ্রাম সিংয়ের দিকে তাকাতে সে মৃদু হেসে বললে,—ওসবই আপনার। অগ্রিম হিসেবে পাঁচ লক্ষ টাকা আপনার পাওনা। আয়রন-চেস্টএ তুলে রাখুন। আপাতত আমি বিদায় নিচ্ছি বাবুজী। সন্ধ্যার পরে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসব। একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি—আমি প্রস্তুত। যেদিন হুকুম করবেন সেইদিনই লোকজন নিয়ে আপনার পিছনে এসে দাঁড়াব।

হাসতে হাসতে সংগ্রাম সিং চলে গেল।

রমাশঙ্করবাবু কয়েকটা মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নীচে মোটরগাড়ির আওয়াজ হতে বুঝলেন সংগ্রাম সিং গাড়ি নিয়ে ফিরে গেল। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য জানলা দিয়ে নীচে তাকালেন।

না, সংগ্রাম সিং সত্যি চলে গেল।

রমাশঙ্করবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াতে দেখলেন দরজার কাছে সমরু দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখখানা মৃতের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

রমাশঙ্করবাবু বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। সহজেই অনুমান করে নিলেন যে সমরুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে নিয়ে এসেছে। হয়তো নির্যাতন করাও হয়েছে। কিংবা তাকে শাসান হয়েছে। তাই সমরু ভয়ে দিশে হারিয়েছে।

রমাশঙ্করবাবু মৃদু হেসে সমরুকে বললেন,—কি রে বাড়িটা তোর কেমন লাগছে? চমৎকার বাড়ি। এখানে থাকলে মন স্বাস্থ্য দুটোই ভাল হবে, কি বলিস। যা এক কাপ গরম কফি নিয়ে আয় দিকি। অনেকদিন তোর হাতে তৈরী কফি খাইনি।

সমরু কলের পুতুলের মত চলে যাচ্ছিল, রমাশঙ্করবাবু ডাকলেন,—সমরু শোন!

সমরু দাঁড়াল।

রমাশঙ্করবাবু বললেন,—হ্যাঁরে ওবাড়ি থেকে আসার সময় আমার জিনিসপত্তরগুলো সব গুছিয়ে এনেছিস তো?

সমরু অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল, জবাব দিল না।

রমাশঙ্করবাবু ইচ্ছাকৃত বিরক্ত হয়ে বললেন,—কি রে জবাব দিচ্ছিস না কেন, বোবা হয়ে গেলি নাকি?

সমরু ঢোঁক গিলে বললে,—বাবু, ওবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। নিষেধ আছে।

—কে নিষেধ করেছে, সংগ্রাম সিং?

—আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না বাবু।

সমরু যেন পালিয়ে বাঁচল অন্য দিন হলে রমাশঙ্করবাবু রাগে ফেটে পড়তেন। কারও বেয়াদপি তিনি সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু সেদিন ব্যতিক্রম হল। তিনি কিছুই বললেন না, মনে মনে শুধু হাসলেন।

কিছুক্ষণ পরে সমরু কফি নিয়ে এল। নিঃশব্দে কফির ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে যাবার সময় চট্ করে একটা চিরকুট কাগজ রমাশঙ্করবাবুর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ভ্রমর সিং তখন প্রফেসর সেনের···মাসাজ করে দিচ্ছিল।

রমাশঙ্করবাবু চিরকুটটা তুলে নিয়ে পড়লেন। আঁকাবাঁকা কাঁচা হাতে কটি কথা লিখেছে সমরু স্বয়ং। লিখেছে—'সব কথা লিখে জানাব। আপনি বেশী প্রশ্ন করবেন না। এরা আমাদের শত্রুর। সব সময় নজর রাখছে।'

রমাশঙ্করবাবু গুম হয়ে গেলেন।

* * *

ওদিকে মণিশঙ্করের চিঠি পেয়ে সুরেশ তখনই সমস্ত কাজ ফেলে ছুটে গেল প্রফেসর ত্রিদিব সেনের বাড়ি।

ভ্রমর সিং তখন প্রফেসর সেনের দেহ পাউডার দিয়ে মাসাজ করে দিচ্ছিল।

সুরেশ তাঁকে মণিশঙ্করের লেখা সুদীর্ঘ চিঠিটা পড়ে শোনাতে প্রফেসর সেন যুদ্ধের ঘোড়ার মত চনমন করে উঠলেন।
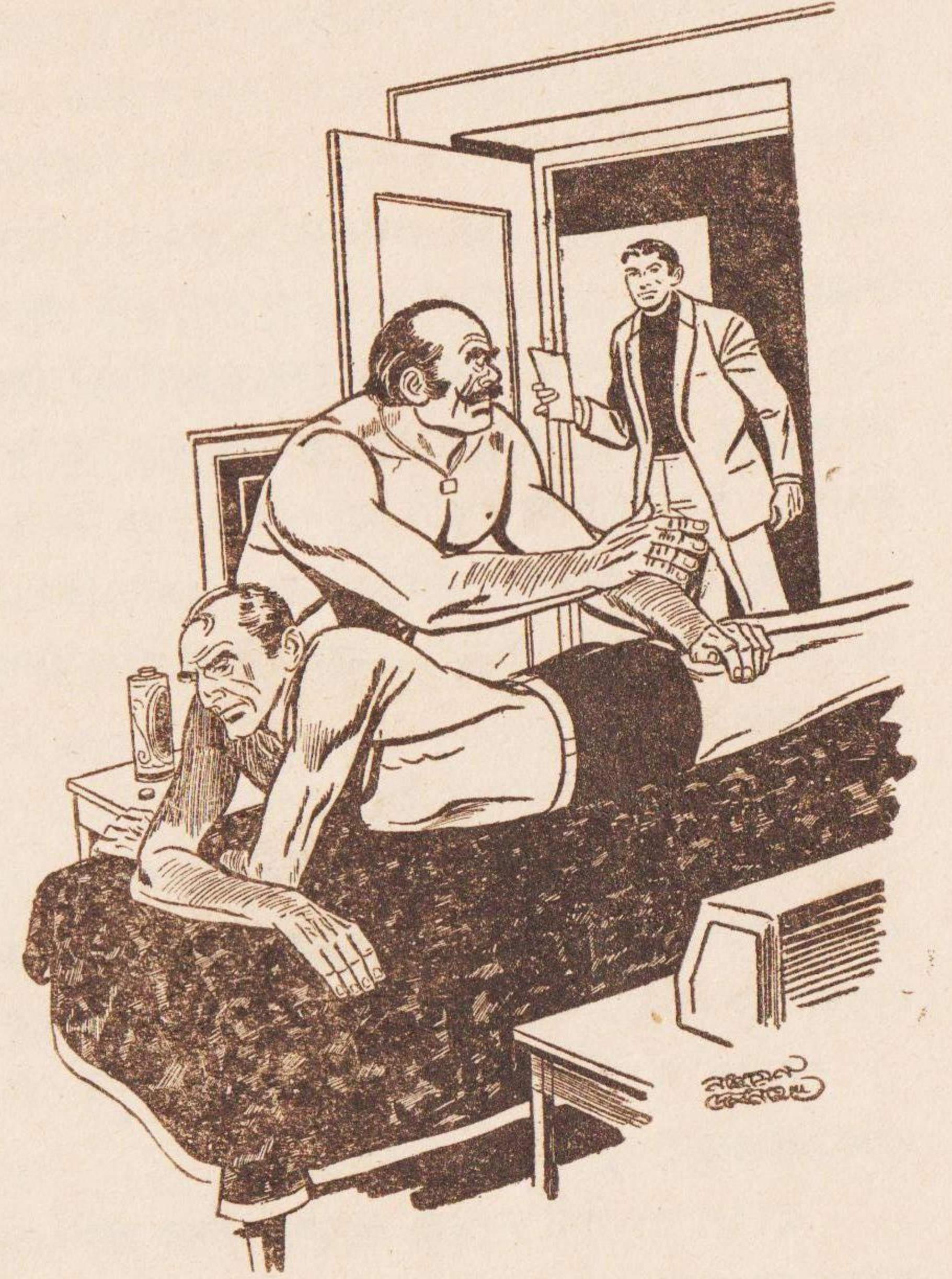
—রত্নসিংহাসন, রত্নসিংহাসন। যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের সম্পত্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। রুশ পর্যটক নিকিতিনের বিবরণে রত্ন-সিংহাসনের কথা লেখা আছে বটে। সুলতান ফিরোজ শাহের বেগম, কি যেন নাম তার··· মনে পড়েছে মনে পড়েছে, আসমানী বেগম। তার কবর খুঁড়ে পাওয়া গেছে একটা শিলালিপি।······খুব স্বাভাবিক। সুরেশ, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও। আমাদের আজই রওনা হতে হবে। রমাশঙ্কর চাটুয্যেকে রক্ষা করতে না পারলে ইতিহাস বোবা হয়ে যাবে। রত্ন-সিংহাসনের কথা কেউ জানতে পারবে না। হারি আপ্ সুরেশ! আমি টিকিটের ব্যবস্থা করছি। ঈভনিং ফ্লাইটে তুমি আমি আর ভ্রমর সিং রওনা হব। হারি আপ্—

আনন্দে সুরেশ লাফিয়ে উঠল। সেই হিমালয় থেকে ফিরে আসার পর নির্জীবের মত দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি জীবনটা শেষ হতে চলেছে। থ্রিল ছাড়া সে থাকতে পারে না।

প্রফেসর সেন তাগাদা দিতে সে ছুটল বাড়ি। ছোটভাই নরেশ তখনও অফিসে যায়নি। তাকে নিভৃতে ডেকে মণিশঙ্করের চিঠির কথা জানিয়ে বললে,—মাকে কিছু বলিস না। আজই আমরা বাঙ্গালোরে যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না। হয়তো মাসখানেক দেরিও হতে পারে। হায়দ্রাবাদে পৌঁছে অবস্থা বুঝে তোকে চিঠি দেব। কেমন—?

নরেশ সম্মতি জানিয়ে শুধু বললে,—তুই বেশ আছিস দাদা! আমাকে একবারও সঙ্গে নিচ্ছিস না।

সুরেশ ওর পিঠ চাপড়ে বললে,—সময় হলে তোকেও সঙ্গে নেব রে। চলি, দেরি করলে চলবে না।

সুরেশ নিজের জামাকাপড় সুটকেসে গুছিয়ে নিয়ে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রওনা হল।

* * *

রাত্রি নটা নাগাদ এরা তিনজনে বাঙ্গালোরে পৌঁছল।

বাঙ্গালোরে আমকরা হোটেলে মণিশঙ্কর অপেক্ষা করছিল। চিঠিতে ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছিল।

সেইমত এয়ারফিল্ড থেকে সোজা হোটেলে গিয়ে হাজির হল এরা তিনজনে। তিনজনের হাতে তিনটে মাত্র সুটকেস। ভ্রমর সিংকে তো চেনবার উপায় নেই। সুট বুট পরে পুরোদস্তুর সাহেব বনে গিয়েছিল। তবে তার যমদূতের মত বিরাট চেহারা দেখে মাঝে মাঝে লোকেরা কানাকানি করছিল।

মণিশঙ্কর হোটেলেই ছিল।

নানান দুশ্চিন্তায় সে যেন একেবারে চুপসে গিয়েছিল। এরা তিনজনে হোটেলে পৌঁছে আলাদাভাবে তিনটে সিঙ্গল্ রুম ভাড়া নিল। এমন একটা ভাব যেন কেউ কাউকে চেনে না।

প্রফেসর সেন সুরেশকে ইঙ্গিত করে নিজের রুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভ্রমর সিং নিজের রুমে সুটকেস রেখে ফিরে এল প্রফেসর সেনের কাছে। আর সুরেশ নিজের রুম থেকে বেরিয়ে সোজা মণিশঙ্করের রুমে গিয়ে নক করল।

মণিশঙ্কর উৎসুক হয়ে দরজা খুলে সুরেশকে দেখে আনন্দে ওকে জড়িয়ে ধরল,—সুরেশ এসেছিস!

সুরেশ দরজা বন্ধ করে বললে,—তোর চিঠি পেয়ে চুপ করে কি বসে থাকতে পারি! কিন্তু তোর ব্যাপারটা কি? ক'দিনে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছিস যে!

মণিশঙ্কর ম্লান হেসে বললে,—যা ঝক্কি যাচ্ছে। রাত্রে ঘুমোতে পারি না। শুধু চিন্তা চিন্তা আর চিন্তা।

—তোর কাকামণির কোন খোঁজ পাসনি?

—না। একেবারে বেপাত্তা। আমার চিঠিটা প্রফেসর সেনকে দেখিয়েছিলি?

—হ্যাঁ। তিনি আমার সঙ্গে এসেছেন।

—এসেছেন? কোথায়?

—আস্তে—আস্তে! চীৎকার করিস না। প্রফেসর যে এখানে এসেছেন সেকথা তিনি কাউকে জানাতে চান না। তোর এখন কি কোন কাজ আছে?

—না। অ্যাবসোলিয়ুটলি নাথিং—

—তবে আর দেরি করিস না। প্রফেসর এই হোটেলেই রুম নাম্বার ফোর্টিনে আছেন। চলে আয়। সেখানেই আমাদের কথা হবে।

সুরেশ বেরিয়ে গেল।

তার কিছুক্ষণ পরেই মণিশঙ্কর রুম নাম্বার ফোর্টিনে এসে হাজির হল।

পরিচয়ের পালা শেষ হতে প্রফেসর সেন একে একে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মণিশঙ্কর বললে,—কাকামণির ডায়রীটা আমার সঙ্গে আছে, সেটা পড়লেই বুঝতে পারবেন রত্নসিংহাসনের লোভে সংগ্রাম সিং তাঁকে গুম করেছে। এতে কোন ভুল নেই।

—তোমার কাকামণির কাছে যে লোকটা কাজ করছে তার নাম কি বললে?

—সমরু। লোকটার বাড়ি কণ্টাই। ওর আসল নাম সমর জানা। বহুকাল কাকামণির কাছে আছে। লোকটা অবিশ্বাসী নয় বলেই মনে হয়।

—তবে যে তুমি বললে সমরুর আচার-আচরণ কেমন যেন অস্বস্তিকর। তাই ওকে কিছু না বলে চলে এসেছ।

মণিশঙ্কর বললে,—আমার তাই মনে হয়েছে। আসল কথা আমি সমরুকে ঠিক বুঝতে পারছি না।

প্রফেসর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—আচ্ছা, তোমার কাকামণি যে শিলালিপিটা বেগমের কবর থেকে তুলে এনেছিলেন সেটা বর্তমানে কোথায়?

মণিশঙ্কর জবাবে বললে,—জানি না। কাকামণি যে ঘরে বসে কাজ করতেন সে ঘরে অনেক রকমের পাথর ছিল। কোন্‌টা তিনি বেগমের কবর থেকে পেয়েছেন তা বুঝতে পারিনি।

—সমরুকে জিজ্ঞাসা করনি কেন?

—কাকামণির দেখা না পেয়ে আমার মাথার ঠিক ছিল না।

—আচ্ছা, সমরু যে মুদির দোকানের মালিকের কথা তোমায় বলেছিল তাকে কি তুমি দেখেছ?

—হ্যাঁ দেখেছি।

—লোকটাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে কি?

—না।

—কেন?

—সমরু নিষেধ করেছিল। বলেছিল, লোকটা নাকি সুবিধের নয়। ওকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করাই ভাল।

—পুলিস কি বলে?

—পুলিস কোন গা করেনি। ওদের সংগ্রাম সিং করায়ত্ত করেছে।

—তার মানে ব্যাপারটা সুপরিকল্পিত।

—আমারও তাই মনে হয়।

প্রফেসর সেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। সুরেশ, ভ্রমর সিং আর মণিশঙ্কর কাঠের পুতুলের মত বসে রইল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে প্রফেসর সেন সংবিৎ ফিরে পেলেন। পাইপে তামাক ভরে টানতে টানতে একসময় বললেন,—দেখ মণিশঙ্কর, তোমার মুখে যা শুনছি তাতে আমার মনে হয় সোজা পথে গেলে তোমার কাকামণির সন্ধান আমরা কোনকালেই পাব না। আমাদের কাজ করতে হবে গোপনে। এমন কি হায়দ্রাবাদের পুলিসও জানবে না। এককথায় আমাদের ডাকাতের ওপর বাটপাড়ি করতে হবে। আর তা করতে হলে

সর্বপ্রথমে আমি দেবগিরিতে গিয়ে তোমার কাকামণির বাড়িটা দেখতে চাই। কেউ জানবে না। আমরা রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যাব। সমরু যেন আমাদের সঠিক পরিচয় জানতে না পারে। আমরা যাব, ভোররাত্রে ফিরে আসব। আজ এই পর্যন্ত থাক। তুমি যাও, তোমার কাকামণির ডায়রীটা নিয়ে এস। আমরা কাল দেবগিরি রওনা হব।

মণিশঙ্কর তাড়াতাড়ি নিজের রুমে ফিরে গিয়ে যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। রুমের দরজা যেমনকার তেমনি বন্ধ আছে অথচ তার অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ ঘরের মধ্যে ঢুকে তার সুটকেস ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে সমস্ত কিছু ওলট-পালট করে রমাশঙ্করবাবুর ডায়রীটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল।

আশ্চর্য, সুটকেসের মধ্যে প্রায় দু'হাজার টাকা ছিল, তা স্পর্শ করেনি। শুধু মণিশঙ্করকে লেখা রমাশঙ্করের চিঠি আর ডায়রীটা নেই।

মণিশঙ্কর ছুটে ফিরে গিয়ে প্রফেসরকে খবরটা দিতে সবাই ছুটে এল।

সুটকেসটা মেঝের কার্পেটের ওপর পড়ে ছিল। ফাইবারের সুটকেস। চোর ধারাল অস্ত্র দিয়ে সুটকেসের ওপরটা কুপিয়ে কেটেছে।

প্রফেসর সেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। ঐ সময় যাতে হোটেলের বেয়ারা বা অন্য কেউ এসে না পড়ে সেইজন্যে ভ্রমর সিং দরজা বন্ধ করে পাহারা দিতে লাগল।

চোর কোন্ পথে যাতায়াত করেছে তার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। ঘরের জানলা খোলা চোর কার্নিস বেয়ে এসেছিল, আবার সেই পথেই ফিরে গেছে।

মণিশঙ্কর হতাশ হয়ে পড়েছিল।

সুরেশ বললে,—তার মানে, বোঝা যাচ্ছে হায়দ্রাবাদ থেকে কোন লোক মণিকে ফলো করে এসেছে। কি বলুন স্যার ?

প্রফেসর সেন পাইপ টানছিলেন। সুরেশের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মণিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কবে বাঙ্গালোরে এসেছ ?

মণিশঙ্কর জবাব দিল,—গত পরশু বেলা এগারোটায়।

—তার পর থেকে হোটেলের বাইরে বেরোওনি ?

—না স্যার। এয়ারফিল্ড থেকে বেরিয়ে প্রথমে গেছি পোস্ট অফিসে। সেখান থেকে সোজা ফিরে এসে সুরেশের চিঠিতে আমার ঠিকানা লিখে একজন বেয়ারাকে দিয়েছিলাম পোস্ট করার জন্যে। তার পর থেকে নিজের রুমেই আছি। কোথাও বেরোইনি।

—সেইজন্যে চোর চুরি করতে পারেনি। আজই বেরিয়েছ আর সঙ্গে সঙ্গে চোর সুযোগ নিয়েছে। তার মানে বুঝতে পারছ আমাদের শত্রুপক্ষ কতটা প্রিপেয়ার্ড। আমাদের আরও সাবধান হতে হবে। শোনো, আজ গভীর রাত্রে আমরা তিনজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাব। তুমি কাল সকালে এয়ারফিল্ডে যাবে। সেখান থেকে হায়দ্রাবাদ। মনে রেখ, আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকব অথচ কেউ কাউকে চিনব না। হায়দ্রাবাদে পৌঁছে তুমি যাবে দেবগিরি। আমরা তোমার পিছু নেব। কেমন, মনে থাকবে—

মণিশঙ্কর সম্মতি জানাল।

* * * (ক্রমশঃ)

বলতে পার ?

ছবি দুটো দেখতে এক রকম হলেও দুটোর মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলি খুঁজে বার কর তো—

(না পারলে ৪১৬ পৃষ্ঠায় দেখ)

দেবগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

৫

মণিশঙ্কর কেমন যেন বেকুব বনে গিয়েছিল।

তাকে অনুসরণ কে করল? সমরু ছাড়া আর তো কেউ জানত না ডায়ারীর কথা। তবে কি সমরুকেও সংগ্রাম সিং বশ করেছে?

সারা রাত মণিশঙ্করের ঘুম হল না। ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজনায় আর আশঙ্কায় ছটফট করেছে।

গভীর রাত্রে প্রফেসর সেন আর ভ্রমর সিং হোটেল পরিত্যাগ করে যাবেন। কোথায় বাকি রাতটুকু কাটাবেন কে জানে। সুরেশ আর সে সকালে যাবে এয়ারফিল্ডে। এমন-ভাবে যেতে হবে যেন কেউ কাউকে চেনে না। তারপর…

এভাবে কি রমাশঙ্করের খোঁজ পাওয়া যাবে?

নানান প্রশ্ন মণিশঙ্করের মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

এইভাবে রাত কেটে গেল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে ছেঁড়াকাটা সুটকেসটা ফেলে রেখেই এয়ারফিল্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হল। তার জামাকাপড় সুরেশকে আগেই দিয়ে দিয়েছিল।

হায়দ্রাবাদে তাকে ফিরে যেতে হবে।

সুরেশ এসেছে কি না সে জানে না। আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। লাউঞ্জে

অপেক্ষা করতে লাগল। তখন প্লেন ছাড়তে আধঘন্টা দেরি। কিছুক্ষণ পরে এল সুরেশ। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

ওকে দেখার পরে মণিশঙ্কর কিছুটা আশ্বস্ত হয়। যাক্, সে একা যাচ্ছে না।

ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রফেসর সেন আর ভ্রমর সিংয়ের দেখা পেল না।

তারও কিছুক্ষণ পরে প্লেন ছাড়ল। মণিশঙ্কর আগুপিছু তাকিয়ে দেখল যাত্রিসংখ্যা মাত্র দশজন। সুরেশ সবার শেষে বসে আছে। তার পাশে বিরাট বপু নিয়ে বসে আছে এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। কদাকার চেহারা। চোখে চোখ পড়লে সর্বাঙ্গ শিরশির করে ওঠে। লোকটা যেন মণিশঙ্করকে গিলছে। মণিশঙ্কর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বসল।

* * * *

হায়দ্রাবাদে পৌঁছে মিলিটারী কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মণিশঙ্কর হয়রান হয়ে পড়েছিল। অথচ আশ্চর্য, সুরেশকে দু'চারটে প্রশ্ন করেই তারা ছেড়ে দিল।

প্রায় আধঘন্টা পরে ছাড়া পেয়ে মণিশঙ্কর এয়ারফিল্ডের বাইরে এসে দাঁড়াতে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার সেলাম ঠুকে দাঁড়াল, বাবুজী, শেয়ারমে যাইয়েগা—

—নেহি।

—আইয়ে না সাব, তিন আদমী মিল গ্যয়ে, আপ হোনেসে যা সকতা। চলিয়ে সাব, কাঁহা যাইয়েগা—

—দেবগিরি—

—আল্লা আপকা ভালা করে। তিন আদমী দেবগিরি যাতে হেঁ সাব—

কথাটা শুনেই মনে খটকা লাগল। তিনজন লোক শেয়ারে দেবগিরি যাচ্ছে। অদ্ভুত যোগাযোগ তো। মণিশঙ্কর রাজী হয়ে গেল। ট্যাক্সিতে এসে দেখল সেই কুৎসিতদর্শন মারোয়াড়ীটার পাশেই সুরেশ বসে আছে। মারোয়াড়ী লোকটাকে দেখে সে যতটা বিরক্ত হল ঠিক ততটাই খুশী হল সুরেশকে দেখে। মণিশঙ্কর দ্বিধা না করে সুরেশের পাশে বসে পড়ল।

ড্রাইভারের পাশে যে লোকটা বসে ছিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে মণিশঙ্কর চমকে ওঠে। আরে ঐ লোকটা যে প্লেনে তার পাশেই বসে ছিল। লোকটা জাতে মুসলমান। মাথায় ফেজ। চোখে কালো চশমা। পরনে শেরওয়ানী। লোকটার মুখখানা মমির মত নিষ্প্রাণ।

সুরেশ মিটমিট করে হাসছিল। একসময় সকলের অলক্ষ্যে মণিশঙ্করকে খোঁচা মেরে চুপচাপ বসে থাকতে ইঙ্গিত করল সে।

* * * *

রাত তখন আটটা।

দেবগিরির পথঘাট জনশূন্য। মাঝে মাঝে দু'একটা সরকারী অফিসের গাড়ি কিংবা পুলিসের জীপ যাতায়াত করছে। দু'একটা মুদিখানার দোকান খোলা রয়েছে।...

সেদিন আবার অমাবস্যা। রাতের অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে—

এই সময় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চারটে লোক এসে দাঁড়াল রমাশঙ্কর চাটুয্যের বাড়ির কাছেপিঠে।

বাড়িটাকে সরকারী কোয়ার্টার বলা চলে।

একটা গাছের নীচে জমাট অন্ধকারের মধ্যে ওরা দাঁড়াল।

ওদের মধ্যে একজন ফিসফিস করে বললে,—বাড়িটা বন্ধ। দেখে মনে হচ্ছে কেউ নেই।

কণ্ঠস্বরে চেনা গেল। লোকটি আর কেউ নয়, প্রফেসর সেন। অর্থাৎ সেই মুসলমান ভদ্রলোক।

মণিশঙ্কর বললে,—সমরু থাকে। লোকটা ভীতুপ্রকৃতির। সন্ধ্যে থেকেই দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। চলুন স্যার—

—দাঁড়াও। ভ্রমর সিং, তুমি আর সুরেশ বাইরে পাহারায় থাক। একজন সামনে, একজন পিছনে। বিপদ্ বুঝলে সংকেত পাঠাবে।

মারোয়াড়ীর ছদ্মবেশে এসেছিল ভ্রমর সিং। অবশ্য এখনও তারা ছদ্মবেশেই আছে। দেবগিরিতে যাতে কেউ ওদের চিনতে না পারে। এমন কি পুলিসও জানবে না, চিনবে না। ওরা অতি সাধারণ মানুষদের একজন হয়ে থাকতে চায়। তাতে কাজের অনেক সুবিধে—

আদেশমত সুরেশ আর ভ্রমর সিং পাহারায় রইল। প্রফেসর সেন মণিশঙ্করের সঙ্গে গেলেন রমাশঙ্করবাবুর বাড়িতে। কিন্তু সদর দরজায় তালা দেখে মণিশঙ্কর অবাক্ হল।

—সমরু নেই নাকি! তালা দিয়ে কোথায় গেল—

প্রফেসর সেন ক্ষণিক ভেবে নিয়ে বললেন,—হয়তো ভয়ে পালিয়ে গেছে।

—তাহলে কি করে ভেতরে ঢুকবেন স্যার?

—আর কোন দরজা নেই?

—হ্যাঁ, পিছনের দিকে একটা দরজা আছে। আমাদের বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে যেতে হবে।

অবলীলাক্রমে ওরা পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ির পিছনের দিকে গিয়ে হাজির হল। দোতলা বাড়ি। পিছনের দিকে দরজা বন্ধ ছিল।

প্রফেসর ত্রিদিব সেনের কাঁধে ছিল ছোট একটা ঝোলা। মণিশঙ্করকে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে বলে প্রফেসর সেন ঝোলা থেকে সিল্কের একটা মাঝারি আকারের দড়ি

বের করে ল্যাসোর ফাঁস বেঁধে ছুঁড়ে দিলেন দোতলায় রেলিংদেওয়া বারান্দার গায়ে।

মৃদু একটা শব্দ হল।

প্রফেসর সেন দড়িটা টানতে দেখলেন রেলিংএ দড়ি আটকে গেছে। তাঁর ক্ষিপ্রতা দেখে মণিশঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল। কতটুকু বা সময় লাগল।

প্রফেসর সেন অনায়াসে দড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দোতলায়। তাঁকে আর দেখা গেল না। মণিশঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল বোধহয় মিনিট তিনেক।

তারপর খুট করে শব্দ হতেই মণিশঙ্কর সবিস্ময়ে দেখল প্রফেসর সেন পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

মণিশঙ্কর তাঁর ঝোলাটা নিয়ে ছুটে গেল। প্রফেসর সেন ওকে নিয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন,—এইবার বল তোমার কাকামণি কোন্ ঘরে বসে কাজ করতেন।

দড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দোতলায়।

মণিশঙ্কর বললে,—ঘরটা দোতলায়। চলুন, নিয়ে যাচ্ছি।

বিড়ালের মত নিঃশব্দে ওরা দোতলায় রমাশঙ্করবাবু যে ঘরে বসে কাজ করতেন সেই ঘরে এল।

মণিশঙ্কর টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালতে যাচ্ছিল, প্রফেসর সেন বাধা দিয়ে বললেন, —লাইট জ্বেল না। আমার কাছে টর্চ আছে।

প্রফেসর পেনসিল টর্চ জ্বেলে প্রায় পনের মিনিট ধরে রমাশঙ্করবাবুর টেবিল, ড্রয়ার, আসমানী বেগমের কবর থেকে পাওয়া শিলালিপিটি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

না কোথাও কিছু পেলেন না। মণিশঙ্কর একসময় বললে,—আমার মনে হচ্ছে আমি চলে যাওয়ার পরে এঘরের সব কিছু কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। কাকামণির টেবিলে আরও বইপত্তর ছিল। ঐ শিলালিপিটা ওদিকের ঐ কাঠের স্ট্যাণ্ডটার ওপরে ছিল। এই দেখুন পাথরের মূর্তিটা ফেলে ভেঙ্গে[illegible]।

প্রফেসর সেন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন,—তোমার কাকামণি কি পাশের ঘরটায় শুতেন?

—হ্যাঁ। দুই ঘরের মাঝে দরজা আছে।

দুজনে রমাশঙ্করবাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। টর্চের আলোয় দেখা গেল একটা নেয়ারের খাটিয়ায় বিছানা পাতা আছে। আর একটা টেবিল আর একটা চেয়ার ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই।

টেবিলের ওপর বহু বই আর কতকগুলো মাসিক পত্রিকা, দৈনিক কাগজ ছড়ান রয়েছে।

মণিশঙ্কর বইগুলো নাড়াচাড়া করে বললে,—ওঘর থেকে বইগুলো এঘরে এনে রেখেছে। আমার মনে হয় এসব সমরুর কাজ। যাবার আগে যা পেরেছে গুছিয়েছে।

—তোমার কাকামণির স্যুটকেস কোথায়?

—স্যুটকেসটা খাটিয়ার নীচে ছিল।

খাটিয়ার নীচে টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল স্যুটকেসটা যথাস্থানে নেই। মণিশঙ্কর মন্তব্য করল,—নিশ্চয় সুযোগ বুঝে সমরু স্যুটকেস নিয়ে পালিয়েছে।

—স্যুটকেসে টাকাপয়সা ছিল?

—হ্যাঁ। হাজার দেড়েক টাকা ছিল। যাবার সময় আমি টাকাগুলো নিয়ে গেছি।

—সমরু কতকগুলো জামাকাপড় নিয়ে কি করবে? সমরু নেয়নি—

—তাহলে কে নেবে?

—অন্য কেউ—

ঠিক এই সময় প্রফেসর সেনের বুকপকেটে ইণ্ডিকেটর যন্ত্রটা মৃদু আওয়াজ করে উঠল। একবার—দুবার—তিনবার।

প্রফেসর সেন সজাগ হয়ে ওঠেন।

—মণিশঙ্কর, শীগ্গির নীচে নেমে চল। সুরেশ সাবধান করে দিচ্ছে। কেউ এবাড়িতে আসছে। হারি আপ্—

প্রফেসর সেন আর মণিশঙ্কর দ্রুত নেমে এসে সিঁড়ির নীচে গা ঢাকা দিল।

পরক্ষণেই সদর দরজার সামনে এসে দাঁ[illegible]াল একটা গাড়ি। গাড়ি থেকে নামল দুজন লোক। চটপট তালা খুলে ওরা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। দুজনের হাতেই টর্চ ছিল।

লোক দুটো কথা বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। ওরা চলে যেতে মণিশঙ্কর বললে,—স্যার, সমরু।

ওরা ওপরে চলে যেতে প্রফেসরের বুকপকেটে ইণ্ডিকেটর যন্ত্রটা আবার শব্দ করল মৃদু স্বরে। এবার একবার।

প্রফেসর সেন বুকপকেটে হাত দিয়ে সংকেত পাঠালেন।

আবার সংকেত এল। কঁক্ কঁক্ শব্দ তুলে।

প্রফেসর সংকেত ফেরত পাঠিয়ে মণিশঙ্করকে বললেন,—এরা দুজন লোক এসেছে। গাড়িতে তৃতীয় কোন লোক নেই। শোন, সমরু আর তার সঙ্গীকে ঘায়েল করতে হবে। আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হও। ভয় নেই, সুরেশ আর ভ্রমর সিং সদর দরজার বাইরেই ওত পেতে আছে। ওদের চীৎকার করতে দেওয়া চলবে না।···

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।

প্রায় মিনিট দশেক পরে সমরু আর তার সঙ্গী নেমে এল। সমরুর হাতে ছিল ব্লাক্সের বই আর তার সঙ্গীর কাঁধে ছিল কয়েকটা ভারী শিলাখণ্ড। শিলাখণ্ডগুলো দেখতে অনেকটা মশলা-বাটা শিলের মত।

কথা বলতে বলতে ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামছিল।

সমরুর সঙ্গী খুবই বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলতে লাগল,—তোমার ঐ বাবুটা আসার পর থেকে আমাদের ঝামেলা শুরু হয়েছে। পাথর আনো, বই আনো। আসল কাজের নাম নেই, যত সব ঝামেলা। ডাক্তারবাবু বলছিলেন কাজ শেষ হলেই তোমার বাবুকে খতম করা হবে।

—কাজ শেষ হলে তো খতম করবে, তার আগে তো নয়।

—ছ মাসের মধ্যে তোমার বাবুকে কাজ শেষ করতেই হবে।

—মুখে বললেই তো কাজ শেষ হবে না। অতবড় বিন্ধ্যপর্বতটা খোঁড়াখুঁড়ি করা কি মুখের কথা!

বলতে বলতে ওরা নীচে নেমে সদর দরজা অতিক্রম করতেই ভ্রমর সিং আর সুরেশ ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের দুজনের ওপর। সমরুর সঙ্গী লোকটা তাগড়াই। কিন্তু ভ্রমর সিংয়ের কাছে কিছুই নয়। এককালে সে ছিল উত্তর ভারতের নামকরা ডাকাত। অসুরের মত তার শক্তি।

ওর একটা লাথি লোকটার পেটের ওপর পড়তেই সে আর্তনাদ করার সময় পেল না, লাট্টুর মত পাক খেয়ে ছিটকে পড়ল পথের ওপর। তারপর টুঁ শব্দ করল না, কেবল পেট চেপে ধরে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল।

সমরু হতবাক্।

বই ফেলে দিয়ে বেচারা বলির পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল। সুরেশ ওকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

প্রফেসর সেন আর মণিশঙ্কর সিঁড়ির নীচে থেকে বেরিয়ে এলেন।

প্রফেসর সেন সমরুর মুখের ওপর তাঁর পেনসিল টর্চের স্নিগ্ধ আলো ফেলে মণিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলেন,—দেখ তো মণিশঙ্কর এই লোকটা সমরু কি না—

—হ্যাঁ স্যার।

মণিশঙ্করকে দেখে সমরু আতঙ্ক হয়ে বললে,—দাদাবাবু, আপনি এয়েচেন! দাদাবাবু গো আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। তুমি ঠিকই বলেছিলে, সংগ্রাম সিং আমাদের বাবুকে খাণ্ডেল-ওয়ালা ডাক্তারের বাড়িতে আটকে রেখেছে।

মণিশঙ্কর ওকে ধমকে ওঠে,—চুপ কর হতভাগা, চীৎকার করিস না!

ইতিমধ্যে ভ্রমর সিং সমরুর সঙ্গীর জ্ঞানহীন দেহটা কাঁধে নিয়ে ভেতরে ফিরে এসেছে। প্রফেসর সেনের আদেশমত লোকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নীচের একটা ঘরে ফেলে রেখে শিকল তুলে দেওয়া হল। তারপর সদর দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে সবাই মিলে দোতলায় রমাশঙ্করবাবুর শয়নকক্ষে ফিরে এসে লণ্ঠন জ্বেলে সুস্থির হয়ে বসে সমরুর কথা শুনতে লাগল।

ছিটকে পড়ল পথের ওপর। [পৃষ্ঠা ৫১৮

প্রশ্নের উত্তরে সমরু বলতে লাগল,—দাদাবাবু, যেদিন আপনি এখান থেকে চলে গেলেন সেদিন রাত্রেই সংগ্রাম সিংয়ের লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল খাণ্ডেলওয়ালা ডাক্তারের বাড়িতে। সেখানে ডাক্তারবাবুর হুকুমে তার লোকজন আমাকে ঘা কতক দিয়ে বললে, তোর বাবুর ভাগ্নে কোথায় গেছে বল। মারের ভয়ে আমি সব সত্যি কথা বলে ফেললুম। আপনি বাবুর ডায়ারী টাকা নিয়ে গেছেন শুনে ডাক্তারবাবু তক্ষুণি বাঙ্গালোরে লোক পাঠাল। ডায়ারীতে কি লেখা আছে আমি জানতাম। বাবুর অনুপস্থিতিতে পড়েছি।

কিন্তু বিশ্বাস করুন বাবু সেকথা আমি প্রকাশ করিনি। আমি চাকরবাকর মানুষ। লেখা-পড়া জানি না। ওরা আমার এ কথাটা বিশ্বাস করেছে।

যে রাত্রে ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল তার পরের দিন সকালে বাবুকে ওরা নিয়ে এল। বাবুর কি চেহারা হয়েছে! শুনলাম ওঁকে সাত দিন ভাল করে খেতেই দেয়নি। বাবুকে দেখে তো আমার কান্না পাচ্ছিল।

আমার মনে হয় সংগ্রাম সিং আর খাণ্ডেলওয়ালা ডাক্তারের কথামত কাজ করতে বাবু রাজী হয়েছেন। নইলে ওরা কখনই বাবুকে অত আদরযত্ন করত না। ভাল খেতে দিচ্ছে, ভাল বাড়িতে ভাল বিছানায় শুতে দিচ্ছে। পাঁচ লক্ষ টাকাও দিয়েছে। কোন অভাব রাখেনি। বাবুর দেখাশোনা করার জন্যেই ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গেছে বুঝলাম।

কিন্তু দাদাবাবু, আমি বেশ ভাল করেই জানি সংগ্রাম সিং আর খাণ্ডেলওয়ালার মতিগতি ভাল নয়। বাবু ওদের কাজ শেষ করে দিলেই ওরা বাবুকে খুন করে লাশ কবর দিয়ে দেবে।

প্রাণের ভয়ে আমি সব কথা বাবুকে বলতে পারি না। চিঠি লিখে যতটা পেরেছি জানিয়ে দিয়েছি। সংগ্রাম সিংয়ের লোক সব সময় আমার কাছেপিঠে থাকে। বাবুর ঘরে গেলে ওরা দরজার বাইরে থেকে কান খাড়া করে শোনে। সংগ্রাম সিং আমাকে বাবুর সঙ্গে কথা বলতে বারবার নিষেধ করে দিয়েছে। বলেছে, যদি ভুলেও কোন কথা বলে ফেলিস তাহলে তোর মাংস কেটে কুকুরকে খাওয়াব।

ওরা মুখে যা বলে কাজে তাই করে। প্রথম দিন আমাকে এমন মার মেরেছে যে আজ পর্যন্ত গা গতরের ব্যথা যায়নি।

আজ সন্ধ্যেবেলায় বাবুকে চা দিতে গিয়েছিলাম, সেই সময় বাবু আমার হাতে একটা চিঠি গুঁজে চুপিচুপি বললেন, চিঠিটা ওবাড়িতে আমার টেবিলের ওপর রেখে আসবি। যদি মণিশঙ্কর ফিরে আসে তবে চিঠিটা পেয়ে আমাদের উদ্ধার করার একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।

চিঠিটা আমি কাপড়ের খুঁটে লুকিয়ে রেখেছিলাম। রাত আটটার সময় রোজই সংগ্রাম সিং আর খাণ্ডেলওয়ালা ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসে। আজও এসেছিল। বাবু ওদের বললেন, দেখ সংগ্রাম সিং সমরুকে একবার ওবাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পার? আমার ঘরে কতকগুলো বই আছে নিয়ে আসবে।

সেকথা শুনে সংগ্রাম সিং ড্রাইভারকে পাঠাচ্ছিল কিন্তু বাবু বললেন, সমরুকে ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠাও। সমরু জানে কোথায় কোন্ বইটা আছে।

সেকথায় কাজ হল। সংগ্রাম সিং আমাকে ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। আমি বই নিতে এসে ড্রাইভারকে বললাম ঐ বড় বড় পাথরগুলোকে কাঁধে তুলে নিতে। লোকটা যখন গালাগাল দিতে দিতে পাথরগুলো কাঁধে তুলছিল সেই সময় আমি কর্তাবাবুর চিঠিটা টেবিলের নীচে ফেলে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় দেখুন না একবার—

সমরু থামতেই মণিশঙ্কর তাড়াতাড়ি তার কাকামণির শয়নকক্ষে ঢুকে টেবিলের তলা থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে এল। লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল সমরু মিথ্যে বলেনি। রমাশঙ্কর সত্যি চিঠি লিখেছেন।

প্রফেসর সেন বললেন,—মণি, চিঠিটা পড়। কি লিখেছেন শোনা যাক।

আদেশ পেয়ে মণিশঙ্কর পড়তে লাগল। রমাশঙ্কর লিখেছেন:

মণি,

রত্নসিংহাসনের লোভে সংগ্রাম সিং আমাকে ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালার নবনির্মিত রিসার্চ ইন্সটিটিউশনে বন্দী করে রেখেছে। শহরের বাইরে পাহাড়তলিতে এলেই দেখতে পাবে বাড়িটা। মস্ত ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা। আশেপাশে আর কারও বাড়ি নেই। এবাড়িতে চারজন সশস্ত্র গুণ্ডাশ্রেণীর লোক আমাকে পাহারা দেয়। এরা অতি সাংঘাতিক ধরনের। এদের সঙ্গে ব্রেনগান, স্টেনগান, গ্রেনেড ছাড়াও আছে রিভলভার আর দূরপাল্লার রাইফেল। সুতরাং একা খবরদার এস না। এখানকার পুলিস এদের মুঠোর মধ্যে। আমার মনে হয় তুমি যদি ভারতীয় মিলিটারীর সাহায্য নাও তবে হয়তো আমাকে রক্ষা করতে পারবে। চাপে পড়ে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে। আসল ম্যাপটা ওদের হাতে তুলে দিলেও রেহাই নেই। আমাকে মরতেই হবে। ইতি—

তোমার হতভাগ্য কাকামণি।

(ক্রমশঃ)

ছেলেটি কি করছে?

(উত্তর ৫৩৮ পৃষ্ঠায় দেখ।)

দেবগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]
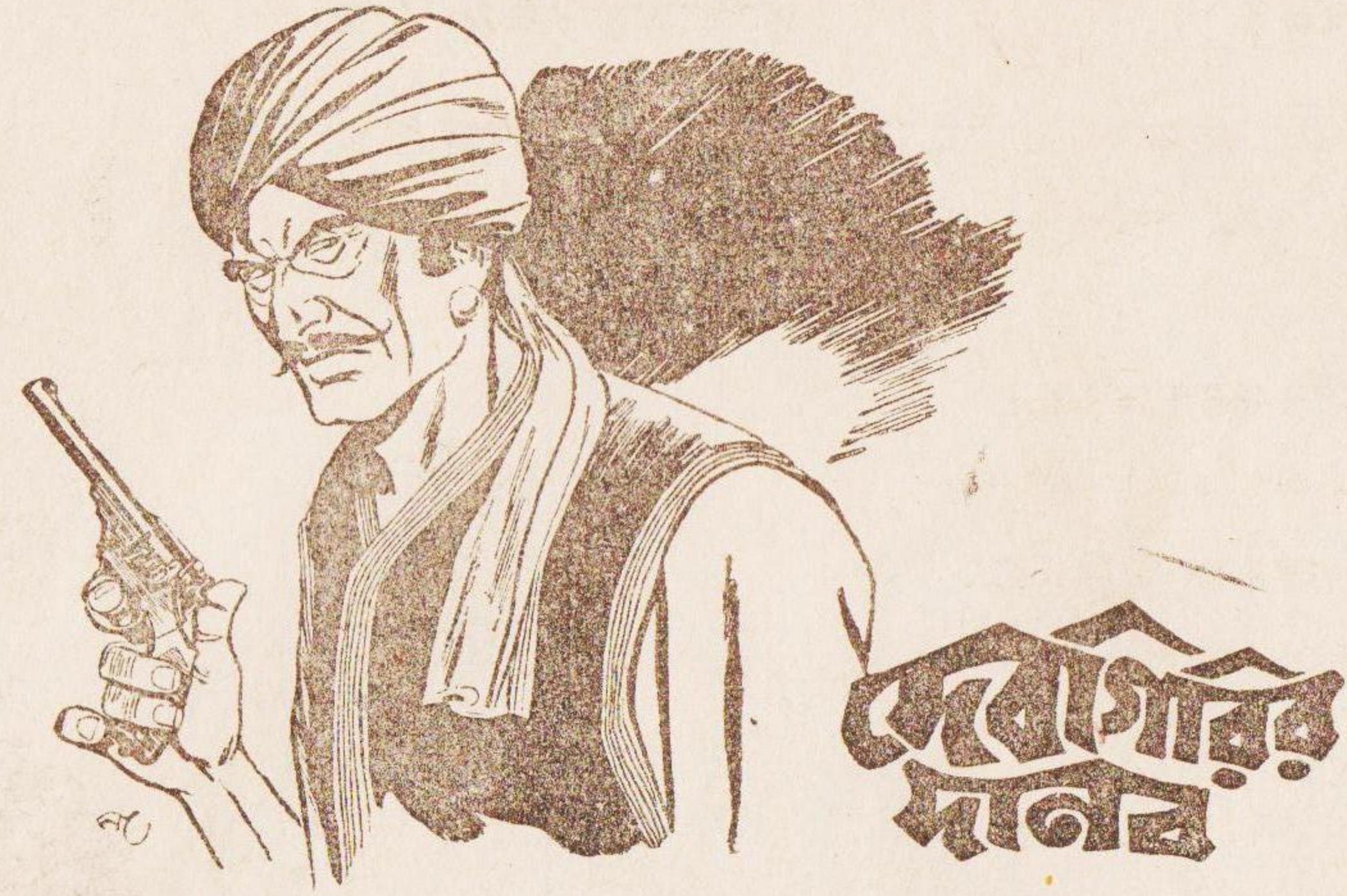
৬

চিঠি পড়া শেষ হল। সবাই চুপ করে আছে।

প্রফেসর সেন বললেন,—আর দেরি নয়, আজকের রাত্রের মধ্যে আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। সমরু ফিরে গেলেও ড্রাইভার যেতে পারবে না। তাহলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে।

সংগ্রাম সিং কিংবা ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালকে কোনরকম সন্দেহ করার সুযোগ দিতে চাই না। রাতারাতি রমাশংকরবাবুকে ওদের অজান্তে সরিয়ে নিয়ে হায়দ্রাবাদ ছেড়ে পালাতে চাই। বর্তমানে হায়দ্রাবাদে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই! ভারতীয় ফৌজ দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করলেও দুচার মাস সময় লাগবে। সেটুকু সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। তার চেয়ে রাতারাতি কাজ শেষ করে সরে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ। দেশে শান্তি ফিরে আসুক তারপর না হয় রত্ন সিংহাসন উদ্ধার করতে আর একবার আসা যাবে।

কেউ প্রতিবাদ করলো না।

প্রফেসর সেন সমরুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার বাবু যে বাড়িতে বন্দী হয়ে আছেন সেখানে ক'জন লোক থাকে?

—চার জন। আমাকে নিয়ে পাঁচজন।

—সংগ্রাম সিং কিংবা ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালা থাকেন না?

—আজ্ঞে না! ওনারা দুবেলা যাতায়াত করেন। সকালে আসেন দুপুরে খান আবার সন্ধ্যায় আসেন রেতের বেলা চলে যান!

—এখনও নিশ্চয়ই আছেন?

—হ্যাঁ বাবু আছেন। আমরা যে গাড়িতে এসেছি সেই গাড়িতে ওরা দুজনে ফিরে যাবে।

—হুম।

প্রফেসর সেন গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন শুরু করলেন,—এখান থেকে ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালার বাড়িটা কতদূরে?

আজ্ঞে তা তিন চার মাইল। গাড়িটা মাঝ পথে একবার বিগড়ে গিয়েছিল কিনা তাই আমাদের দেরি হলো নইলে গাড়িতে গেলে পনের মিনিটও লাগে না।

—হ্যাঁ বাবু আছেন।

প্রফেসর সেনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—মাঝ পথে গাড়িটা বিগড়ে গিয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ড্রাইভার বলছিল গাড়িটা নাকি মাঝে মাঝেই বিগড়ে যায়।

সেকথা শুনে প্রফেসর সেন খুব খুশী হলেন। মনে মনে একটা হিসেব করে নিয়ে সুরেশকে বললেন,—শোন সমরু, আমরা সকলেই গাড়ি নিয়ে পাহাড়তলির দিকে যাব। ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালার রিসার্চ ইনস্টিটিউশনের কাছ বরাবর গিয়ে আমরা চারজন গাড়িতে অপেক্ষা করবো। শুধু তুমি একা বইগুলো নিয়ে বাড়িতে যাবে। সেখানে গিয়ে সংগ্রাম সিংকে বলবে গাড়ি বিগড়ে গেছে তাই তুমি বইগুলো নিয়ে চলে এসেছ। এমনভাবে কথাগুলো বলবে যাতে ওরা ঘুণাক্ষরেও তোমাকে সন্দেহ করতে না পারে। কর্তাবাবুকে কিছু বলবে না। শুধু লক্ষ্য রাখবে দলের চারজন লোক কি করছে। সংগ্রাম সিং আর খাণ্ডেলওয়ালা বেরিয়ে যাওয়ার পর যদি পার তবে চারজন লোককে কথার ছলে অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা করবে।

সমরু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। রমাশংকরবাবুকে উদ্ধার করা হবে শুনে এমনিতেই সে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। বললে,—আপনারা কিছু ভাববেন না বাবু। আমি কণ্টাই জিলার লোক। একটু সাহস পেলে এমন কাজ দেখাব না, যে অতি বড় সাংসীর বুক কেঁপে উঠবে।

সমরুর কথা শুনে সবাই মুচকি হাসল। কেবল ভ্রমর সিং বললে,—হাঁ হাঁ, তোমার মুরোদ আমার জানা আছে। ইয়াদ রাখনা সমরু, কই কাম ইধার উধার হোগা তো তেরা খুন চুস লেগা। মেরা নাম হ্যায় ডাকু ভ্রমর সিং প্যায়লোয়ান।

সমরু শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল ভ্রমর সিংয়ের দিকে। দু চার বার ঢোঁক গিলে বললে,—তুমি বাবা সাক্ষাৎ যমদূত। তোমার লাথি খেয়ে ঐ ব্যাটা ড্রাইভারকে আর চোখ খুলতে হবে না। আমার উপর খামাখা রাগ করোনি।—

প্রফেসর সেন হেসে বললেন,—তোমার কোন ভয় নেই সমরু; হুকুম না পেলে ভ্রমর সিং কখন কাউকে টোকা পর্যন্ত মারে না।

সুরেশ বললে,—স্যার, আমার একটা কথা বলার আছে। প্রফেসর সেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে সুরেশ বললে,—এমনও তো হতে পারে গাড়ি বিগড়ে গেছে শুনে সংগ্রাম সিং আর ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালা আজকের রাতটা ঐ বাড়িতেই কাটিয়ে দেবে।

সমরু তাড়াতাড়ি বললে, না বাবু তা কিছুতেই থাকবে না। অন্ততঃ আজকের রাতটা তো নয়ই। আমি নিজের কানে শুনেছি সংগ্রাম সিং আমাদের বাবুকে বলছিলেন, আজ রাত বারোটার সময় তেনাকে একটা জরুরী কাজে শহরের বাইরে যেতে হবে। সুরেশ জিজ্ঞাসা করল,—ওখানে কি সংগ্রাম সিংয়ের দ্বিতীয় গাড়ি নেই।

সমরু বললে,—না বাবু ও বাড়িতে গাড়ি নেই। ডাক্তার বাবু কখনও নিজের গাড়িতে আসে না। যখন আসে সংগ্রাম সিংয়ের সঙ্গে আসে।

সুরেশের আরও কিছু বলার ছিল কিন্তু প্রফেসর সেন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—আর কোন তর্ক নয় সুরেশ। বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখনেই রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। আমি সমস্ত দিক ভেবে নিয়েছি। আমাদের একটা রিস্ক নিতেই হবে। নাও লেট আস্ মুভ—

প্রফেসর সেনের ওপর সুরেশ কখন কথা বলেনি। অদ্ভুত চরিত্রের লোক ওই প্রফেসর। ওঁর জীবনে ভয় ডর বলে কিছু নেই। বিপদে পড়লে তবে নাকি ওঁর বুদ্ধি খোলে। আর তখন এমন ক্ষিপ্র হয়ে ওঠেন যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

সকলে নীচে নেমে এল। প্রফেসর সেন বললেন,—সুরেশ ড্রাইভারকে একবার দেখে এস। লোকটার যদি জ্ঞান ফিরে থাকে ওকে মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে যেতে হবে। পিছনের শত্রুকে কোন রকম সুযোগ দিতে চাই না।

আদেশমত সুরেশ ড্রাইভারকে দেখতে গেল। প্রফেসর সেন অন্যদের নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। সমরু পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। প্রফেসর সেন চালকের সামনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

এমন সময় সুরেশ ছুটে এল। প্রফেসর সেনকে বললে,—স্যার ড্রাইভার বেঁচে নেই। লোকটার বোধহয় কিড্নী কিংবা লীভার ফেটে গেছে। নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে।

প্রফেসর সেন ভ্রমর সিংয়ের দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে সুরেশকে বললেন,—যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। গেট্ ইন্—

সুরেশ মণিশঙ্করের পাশে গিয়ে বসে পড়ল। প্রফেসর সেন গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত। পথে জনমনিষ্যি নেই। সমরু পথ বলে দিতে লাগল। শহরের বাইরে এসে প্রফেসর সেন কথা বললেন,—সুরেশ···

—বলুন স্যার—

—মণিশঙ্করকে তোমার রিভালবারটা দিয়ে দাও। তুমি নাও রাইফেল।

—আপনি—

—আমার জন্যে ভেব না। আমার কাছে যা আছে তোমাদের কারও কাছে তা নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন,—আমার স্পেকুলেশনে যদি ভুল না থাকে তাহলে একটা গুলিও ছুঁড়তে হবে না। নিঃশব্দে আমরা কাজ হাসিল করে সরে পড়বো।

সুরেশ বললে,—তা যদি না হয়।

প্রফেসর সেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—তাহলে যুদ্ধ হবে। সেটা আমাদের সকলের পক্ষেই মন্দ। জানি না দেবগিরিতে ইণ্ডিয়ান আর্মি এখনও পৌঁছেছে কিনা। যদি পৌঁছে থাকে তবে গুলির শব্দ শুনে তারা আমাদের ঘেরাও করতে পারে।

সুরেশ বললে,—আমাদের সঙ্গে তো আইডেণ্টিটি কার্ড আছে। আমাদের ক্ষতি কিছুই হবে না।

প্রফেসর সেন বললেন,—ভুলে যেও না সুরেশ, আমরা পুলিসের সাহায্য না নিয়ে যুদ্ধে নামতে যাচ্ছি। আইডেন্টিটি কার্ড থাকলে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

কথা বলতে বলতে ওরা পাহাড়তলির কাছে পিঠে এসে পড়েছিল।

এক সময় সমরু বললে,—উই দেখুন বাড়িটা। এখান থেকে বড় জোর পোয়াটাক পথ।

প্রফেসর সেন গাড়ি থামিয়ে বললেন,— সুরেশ, সমরুর কাঁধে বইগুলো তুলে দাও।

মণিশঙ্কর আর সুরেশ আট দশটা বই সমরুর কাঁধে তুলে দিল।

প্রফেসর সেন সমরুকে বললেন,—সমরু, তোমার ওপরই তোমার মনিবের জীবন নির্ভর করছে। তোমার কথায় বার্তায় ওরা যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে। সব সময় মনে রেখ, সংগ্রাম সিং নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে পারলে তোমাদের কাউকে বেঁচে থাকার সুযোগ দেবে না। তোমার মনিব আর তোমাকে খুন করতে ওরা বাধ্য। বুঝেছ?

—হ্যাঁ বাবু খুব বুঝেছি।

—যাও। যেমন শিখিয়েছি ঠিক তেমনি বলে দিও। তোমার সঙ্গে রইল একটা পিস্তল আর এক শিশি ব্রোমাইড। কিমত কাজে লাগবে। বুঝলে—?

সম্মতি জানিয়ে সমরু হনহন করে অন্ধকারে পালিয়ে গেল। পথের পাশে গাড়িটা রেখে প্রফেসর সেন চাপা স্বরে বললেন,—তোমরা পথের পাশে ঐ ঝোপগুলোর পিছনে গা ঢাকা দাও।

আমি ড্রাইভারের অভিনয় করবো। দূর থেকে ওরা আমাকে চিনতে পারবে না।

সুরেশ বললে,—স্যার, মণি ঠিক সমরুকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

প্রফেসর সেন মৃদু হেসে বললেন,—সমরুকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই সুরেশ। রমাশঙ্করবাবুর চিঠিটা সে যদি এ বাড়িতে ফেলে না যেত তাহলে হয় তো ওকে এতটা বিশ্বাস করতে পারতাম না। আর কথা নয়, এবার কাজে নেমে পড়। ভ্রমর সিং, অযথা মানুষ খুন করা আমি পছন্দ করি না। নেহাত প্রয়োজন না হলে কারও গায়ে হাত দিও না। মনে রেখ আমরা ডাকাতি করতে আসিনি। ডাকাতের হাত থেকে একজন নিরীহ লোককে উদ্ধার করতে এসেছি।

ভ্রমর সিং কোন উত্তর দিল না, শুধু নিঃশব্দে হাসল।

* * *

সমরুর সাহস খুব বেড়ে গেল।

বই কাঁধে নিয়ে ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালার বাড়ির কাছ বরাবর যেতেই একজন সশস্ত্র প্রহরী হুংকার দিয়ে উঠল,—কৌন হো।

সমরু কিছুমাত্র পরোয়া না করে বললে,—কে আবার, আমি সমরু। সিংজীর হুকুমে বই আনতে গিয়েছিলাম।

টর্চের আলো এসে পড়ল ওর মুখের ওপর। সেই সঙ্গে দুজন প্রহরী এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একজন বললে,—

—আরে সমরু তুমি। তোমার তো গাড়িতে ফেরার কথা। রূপা সিং কোথায়?

—আর গাড়ির কথা বল না ভাই। যাবার সময় একবার মেসিন বিগড়াল, আসবার

সময় দুবার। মাইল খানেক দূরে গাড়ি পড়ে আছে। রূপা সিং মেসিন ঠিক করছে, আমি আর দাঁড়াইনি, হেঁটেই চলে এলাম।

প্রহরী দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সমরু ওদের তোয়াক্কা না করে গজগজ করতে করতে সোজা দোতলায় রমাশংকরবাবুর শয়নকক্ষে এসে হাজির।

সমরুকে দেখে সংগ্রাম সিং তো রাগে ফেটে পড়ল।

—এতক্ষণ কি করছিলি রে শয়তানের বাচ্চা। আমি তোদের আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে বলেছিলাম। কেন হুকুম খেলাপ করলি। বল, কুত্তার বাচ্চা কোথাকার। ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালা না ধরলে সংগ্রাম সিং বোধহয় সমরুকে লাথি মেরেই বসত। ওকে শান্ত করে খাণ্ডেলওয়ালা সমরুকে জিজ্ঞাসা করল,—সমরু এত দেরি হল কেন? তোমরা তো জান সিংজীকে রাত বারোটার মধ্যে একটা জরুরী কাজে যেতে হবে।

বালিশটা তুলে ফেলতেই দুধরা···পড়ল। [পৃষ্ঠা ৬০৮

সমরু কাঁচুমাচু হয়ে বললে,—আমাদের কোন দোষ নেই বাবুজী। গাড়িটা মাঝপথে তিনবার বিগড়ে গেছে। আমি পায়ে হেঁটে আসছি—

ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালা জিজ্ঞাসা করল,—হেঁটে এসেছ। রূপা সিং কোথায়?

—সে তো গাড়ি নিয়ে মাইলখানেক দূরে পড়ে আছে। দেরি হচ্ছে দেখে আমি বইগুলো নিয়ে চলে এলাম।

সংগ্রাম সিং এবার খাণ্ডেলওয়ালার ওপর ক্ষেপে গেল,—কি আমার কথা মিলছে। আমি তখুনি তোমাকে বলেছিলাম আমার গাড়িটা কদিন ধরেই গোলমাল করছে, আজকের রাতটার মত তোমার গাড়িটা বের কর। তা আমার কথা তো তুমি গ্রাহ্যই করলে না। এখন বোঝ ঠেলা—

রাগে ঘোঁত ঘোঁত করতে লাগল সংগ্রাম সিং।

খাণ্ডেলওয়ালা সমরুকে জিজ্ঞাসা করল,—তোমাকে রূপা কিছু বলেছে নাকি ?

—জী হাঁ। বলছিল আপনারা যদি হেঁটে ঐ পর্যন্ত যান তাহলে ভাল হয়।

—গাড়ি স্টার্ট নেবে ?

—তা একজন পাকা লোক দেখলে মনে হয় চলবে।

সংগ্রাম সিং রাগতস্বরে বললে,—রূপার দ্বারায় আর ড্রাইভারের কাজ চলবে না, বুঝলে ডাক্তার। ওর মাথায় কিছু নেই। চলো, চলো আর দেরি করো না। আমি না গেলে গাড়ি স্টার্ট নেবে না। চলো, এইখানেই এগোরাটা—

সংগ্রাম সিং রেগে গেলে কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সেটা ডাক্তার খাণ্ডেল-ওয়ালার জানা ছিল তাই বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে রমাশংকরবাবুকে বললে,—তাহলে আজকের রাতের মত উঠি। আপনি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে আসতে পারবো না। সন্ধ্যের সময় নিশ্চয়ই আসব। গুড্ নাইট্—

সংগ্রাম সিং আর খাণ্ডেলওয়ালা বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। সমরু চটপট বইগুলো টেবিলের ওপর সাজাতে সাজাতে চাপা হিসহিস শব্দে রমাশংকরবাবুকে বললে,—দাদাবাবু লোকজন নিয়ে এসে পড়েছেন। রূপা সিং খুন হয়েছে। আজ রাত্রের মধ্যে আপনাকে উদ্ধার করা হবে।

কাপড়ের কোঁচর থেকে একটা পিস্তল বের করে চট করে রমাশংকরবাবুর বালিশের তলায় রেখে দিয়ে বললে,—

—দাদাবাবু দিয়েছে। আমি নীচে নজর রাখতে যাচ্ছি—

সমরু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। রমাশংকরবাবু প্রথমটা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সমরু কি বলে গেল। সত্যি না মিথ্যে। মণিশংকর লোকজন নিয়ে এসে পড়েছে। সত্যি না মিথ্যে। তারপর ঐ পিস্তল। ওটা সত্যি না মিথ্যে।

তড়াক্ করে লাফিয়ে তিনি ছুটে গেলেন বিছানার কাছে। বালিশটা তুলে ফেলতেই দুধরা মশার পিস্তলটা চোখে পড়ল। মিথ্যে নয়, সত্যি, সত্যি, সত্যি—

ছোঁ মেরে পিস্তলটা তুলে নিয়ে নিজের পাঞ্জাবির পকেটে রাখলেন। আর তাঁকে পায় কে। দশটা গুণ্ডা এক সাথে এলেও তিনি পরোয়া করেন না। শয়তান সংগ্রাম সিংকে তিনি একবার দেখে নেবেন। আসুক সে ফিরে। সংগ্রাম সিং আর ডাক্তারকে একসাথে গুলি করবেন। পৃথিবী থেকে দু-দুটো পাপ দূর হবে।

রমাশংকরবাবু উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন।

* * *

(ক্রমশঃ)

দেবগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

৭

জমাট অন্ধকারে দুজনে এগিয়ে চলেছে দ্রুত।

রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়ি দেখে সংগ্রাম সিং একসময় রাগে গজগজ করে ওঠে।

—এইখানে সাড়ে এগারোটা। রাত বারোটার মধ্যে আমাকে ক্লাবে পৌঁছুতেই হবে। কয়েকজন মিলিটারী অফিসার আসছেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা আছে। সেখান থেকে যাব নীনা সরখেলের বাড়ি—

—সে আবার কে? ও বুঝেছি, প্রমোদ সরখেলের কেউ হয় বুঝি?

—হ্যাঁ সিসটার হয়। নীনা শিক্ষিতা। রমাশঙ্করবাবুর ডায়েরীটা ওকে দিয়েই পড়াব। অবশ্য প্রমোদকে দিয়ে পড়ালেও হতো। কিন্তু কেন জানি না প্রমোদকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

—ডায়েরীটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ।

—তোমার উচিত ছিল নীনা সরখেলকে তোমার শহরের বাড়িতে নিয়ে আসা। ডায়েরীটা আমাদের কাছে মূল্যবান। ওটা নিয়ে পথে-ঘাটে চলাফেরা করা উচিত নয়।

সংগ্রাম সিং হাসল। বললে,—জানো ডাক্তার রত্ন সিংহাসন আমার স্বপ্ন। আমার পূর্বপুরুষেরা যা পারেনি আমি তাই করতে চলেছি। সুতরাং আমার কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া আর বাঘের মুখ থেকে তার আহার ছিনিয়ে নেওয়া, একই

কথা। ও কথা থাক, আসল কথা বল, রমাশঙ্করবাবুর সঙ্গে কথা বলে কি বুঝলে বল?

ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালা মৃদু হেসে বললে,—লোকটা ধাতস্থ হয়েছে।

—ঠিকমত কাজ করছে—

—হ্যাঁ। দু একদিনের মধ্যেই ম্যাপ আঁকার কাজ শুরু করবে।

—ছল-চাতুরী কিছু নেই তো?

—মনে হয় না। ও বেশ ভাল করেই বুঝেছে, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল। দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল একটা লোক টর্চের আলোয় গাড়ির বনেট তুলে মেসিনের কাজ করছে।

সংগ্রাম সিং বললে,—দেখ তো ডাক্তার লোকটা রূপা সিং না।

—হ্যাঁ। রূপা সিং বলেই মনে হচ্ছে।

ডাক্তার ভাল করে দেখল,—হ্যাঁ। রূপা সিং বলেই মনে হচ্ছে।

সংগ্রাম সিং বললে,—কিন্তু রূপাকে যেন একটু বেশী রোগা বলে মনে হচ্ছে।

ডাক্তার বললে,—অন্ধকারে ওরকম লাগে।

ওরা কথা থামিয়ে আরও জোরে পা চালিয়ে দিল। এদিকে সুরেশ, ভ্রমর সিং আর মণিশঙ্কর ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের দুজনকে দেখতে পেয়ে ইণ্ডিকেটরে খবর পাঠিয়ে দিল।

প্রফেসর সেন টের পেলেন। সাংকেতিক যন্ত্র মৃদু শব্দে জানিয়ে দিল। আশ্চর্য তিনি এতটুকু বিচলিত হলেন না। টর্চ নিভিয়ে বনেট-টা বন্ধ করে চালকের আসনে বসে গাড়ির সেলফ স্টার্টারে চাপ দিতেই কঁ কঁ শব্দে করে মেসিন চালু হল।

মেসিনের আওয়াজ পেয়েই সংগ্রাম সিং খুশী হয়ে ডাক্তারকে বললে,—যাক রূপা সিং ঠিক সময়ে মেসিন চালু করেছে। 'লেট্ আস রান'—।

ওরা পীচ-ঢালা রাস্তায় উঠে দৌড়ে গাড়ির দিকে এগোয়। গাড়ি থেকে মাত্র পনের গজ দূরে এসে পড়তেই প্রফেসর সেন গাড়ির হেড লাইট দুটো জ্বেলে দিল।

ওরা চোখ আড়াল করে এগিয়ে আসতে লাগল। সংগ্রাম সিং চেঁচিয়ে ওঠে,—রূপা, হেড লাইট নেভাও। প্রফেসর সেন হেড লাইট নিভিয়ে দিয়ে ইণ্ডিকেটরে চাপ দিয়ে আক্রমণ করার ইঙ্গিত পাঠালেন।

সংগ্রাম সিং আর খাণ্ডেলওয়ালা ততক্ষণে গাড়ির কাছে এসে পড়েছে। হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে সুরেশ, ভ্রমর সিং বেরিয়ে এসে দুজনের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এ ধরনের আক্রমণের জন্যে দুজনেই প্রস্তুত ছিল না তাই ওরা হতচকিত হয়ে পড়েছিল।

সুরেশ ধরেছিল খাণ্ডেলওয়ালাকে আর ভ্রমর সিং সংগ্রাম সিংকে। দুজনেরই নড়বার শক্তি ছিল না। প্রফেসর সেন আর মণিশঙ্কর দুজনের বুকের ওপর রিভলবার চেপে ধরলেন।

প্রফেসর সেন চাপা গর্জন করে ওঠেন,—সংগ্রাম সিং, ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালা কিছুমাত্র বাধা দেওয়ার চেস্টা কর না। লক্ষ্মী ছেলের মত গাড়িতে উঠে বস।

—কে তুমি ?

—তোমাদের যম।

—এভাবে আমাদের ওপর হামলা করার মানে কি ?

ভ্রমর সিংয়ের ধৈর্যটা বরাবরই অল্প।

সংগ্রাম সিংয়ের কথা শুনে তার মাথায় খুন চেপে গেল। ধাঁ করে সে সংগ্রাম সিংয়ের ঘাড়ে একটা রদ্দা চালিয়ে দিয়ে বললে, যাস্তি বাত হাম পছন্দ নেহি করতা। চুপ রহো।

সংগ্রাম সিং মৃদু আর্তনাদ করে ওঠে। প্রফেসর সেন ভ্রমর সিংকে দ্বিতীয়বার হাত চালাতে নিষেধ করে চটপট দুজনকে সার্চ করে নিরস্ত্র করে ফেললেন। দুজনের পকেটে ছিল দুটো গুলিভরা পিস্তল। একটা ডায়েরী, কিছু টাকা, দুটো টর্চ আর দু-একটা ওষুধ।

সার্চ হয়ে যাওয়ার পরে প্রফেসর সেন দুজনকে মরফিয়া ইনজেকশন দিলেন। দুজনেই সেই সময় চেঁচামেচি করার চেস্টা করেছিল কিন্তু ভ্রমর সিংয়ের হাতে মোক্ষম দু একটা ঘুষি খেয়ে চুপ করে গেল। গাড়ির মেসিন চলছিল। ফলে কোন আওয়াজ বেশী দূর ছড়াতে পারেনি।

স্ট্রং মরফিয়া দেওয়া ইনজেকশনের এক মিনিটের মধ্যেই কাজ শুরু হল। দুজনেই ঢলে পড়ল। তখন ওদের গাড়ির পিছনের আসনে বসিয়ে নিয়ে আসা হল রমাশঙ্করবাবুর বাড়িতে। ভ্রমর সিং অনায়াসে দুজনকে কাঁধে তুলে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এল।

প্রফেসর সেনের হুকুমে দুজনকে রমাশঙ্করবাবুর শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নেয়ারের খাটিয়ার ওপর ফেলে রাখা হল।

যাক চব্বিশ ঘণ্টার মত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

প্রফেসর সেন হাত ঝেড়ে বললেন,—এবার চল দ্বিতীয় কিস্তিতে বাজিমাৎ করতে হবে।

সকলে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। কারও মুখে কথা নেই। প্রফেসর সেন স্টিয়ারিং ধরলেন। গাড়ি ছুটল।

শহরের বাইরে পূর্ববর্ণিত স্থানে এসে প্রফেসর সেন গাড়ি থামিয়ে বললেন,—এইখানেই গাড়িটা থাক। আমরা এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগোব।

প্রফেসর সেন রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললেন—রাত সাড়ে বারটা। হাতে আর আধঘণ্টা সময় আছে। বাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সমরু সংকেত পাঠালে আমরা বাড়িতে ঢুকবো। এসো—

গাড়িটা রাস্তার ধারে একটা ঝোপের পাশে রেখে ওরা গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে এগোল।

* * *

আগেই বলেছি সমরুর সাহস অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

প্রফেসর সেন, সুরেশ, মণিশঙ্কর আর ভ্রমর সিংয়ের মত যমদূত যখন তার সহায় তখন তার ভয় কিসের।

ঠিক সাড়ে বারোটা নাগাদ সমরু কফি তৈরি করে নিয়ে গেল রমাশঙ্করবাবুর কাছে।

রমাশঙ্করবাবু তখন অনেকটা শান্ত হয়েছেন। সমরু কফি নিয়ে আসতে জিজ্ঞাসা করলেন,—রাত কটা বাজল রে ?

সমরু বললে,—সাড়ে বারোটা। আপনি কফি খেয়ে শুয়ে পড়ুন। রাত একটা বাজতে এখনও আধঘণ্টা দেরি আছে।

—তুই শুবি না ?

—হ্যাঁ, এখুনি শুয়ে পড়বো। যারা রাত্রে পাহারা দেবে তাদের একটু কফি দিয়ে শুয়ে পড়ব।

সমরু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখল একজন প্রহরী কান পেতে ওদের কথা শুনছে। প্রহরীর নাম সরখেল। কেন জানি না সমরুর মনে হয় লোকটাকে আগে সে কোথাও

খুব পরিচিত পরিবেশে দেখেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারে না। লোকটা বাঙ্গালী। আর সেই কারণেই বোধহয় সংগ্রাম সিং সরখেলকে সমরুর ওপর খবরদারী করতে বলেছে।

যাই হোক চোখাচোখি হতে সমরু মৃদু হেসে সরখেলকে বললে, আজ আপনি রাত্রে পাহারায় থাকবেন নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তবে এক কাপ কফি খেয়ে নিন। চার কাপ জল বেশী দিয়েছি।

লোকটা খুশী হল। সমরু হনহন করে রান্নাঘরে ফিরে এল। আগে থেকেই সে চিনিতে এক শিশি ব্রোমাইড মিশিয়ে দিয়েছিল। একটা ট্রেতে পাঁচটা কাপ, একপট কফি, ছোট একটা কাঁচের পটে ব্রোমাইড মেশান চিনি আর কনডেনস মিলকের পাত্রটা রেখে সে সরখেলের হাতে দিয়ে বললে,—নিয়ে যান। আপনারা চারজনে যা পারেন খেয়ে আমার জন্যে একটু রেখে দেবেন। বাবুর বিছানাটা ঠিক করে দিয়েই আমি যাচ্ছি।

সরখেল কটমট করে সমরুর দিকে তাকিয়ে বললে, বাবুর বিছানা ঠিক করার ছল করে গিয়ে কোন ফন্দি আঁটবে না তো ?

সমরু হেসে বললে, দেখুন বাবুমশাই, আমার যদি ফন্দি আঁটার কিংবা পালিয়ে যাবার কোন মতলব থাকত তবে রূপা সিং আমাকে কখনই একা অতটা পথ আসতে দিত না। চোখের ওপরেই তো দেখলেন একগাদা বই নিয়ে একা কতখানি পথ চলে এলাম। পালাবার মতলব থাকলে তখনই পালাতে পারতাম।

সমরুর কথায় যেন লোকটা আশ্বস্ত হল। বললে,—তোমার বাবুর মনে কোন মতলব নেই তো ?

—কি যে বলেন তার ঠিক নেই, আমার বাবুর বয়স হয়ে গেছে। ওনার পক্ষে এখান থেকে পালান কি সম্ভব ? তাছাড়া এমনিতেই বাবু বড় ভীতু প্রকৃতির মানুষ।

—আমি বিশ্বাস করি না। তোমার বাবুকে আমি ভালরকম চিনি।

—তা চিনতে পারেন। থাকগে বাবুকে বিশ্বাস না করেন ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাকে অবিশ্বাস করবেন না বাবুমশাই। আমি হচ্ছি চাকর। যে মাইনে দেবে আমি তারই চাকর। সিংজী আমায় একশো টাকা মাইনে দিচ্ছেন এখন তিনিই আমার প্রভু—

—হ্যাঁ একথাটা আমি বিশ্বাস করি। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি বেশী দেরি কর না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে।

সমরু সম্মতি জানাতে লোকটা চলে গেল কফির ট্রে নিয়ে। সমরু চটপট একবারে ছাদে চলে গেল। সেখান থেকে টর্চের আলো ফেলে সংকেত জানাতে থাকে। একবার,

দুবার, তিনবার। তারপর মনে মনে তিরিশ সংখ্যা গুনে আবার তিনবার সংকেত জানিয়ে নেমে গেল রমাশঙ্করবাবুর ঘরে।

রমাশঙ্করবাবুর কফি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সমরুকে দেখে তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি খবর ?

—খবর পাঠিয়েছি। আপনি শুয়ে পড়ুন। রাত একটার সময় তেনারা আসবেন।

—রাত একটা ?

—চুপ, কথা নয়।

সমরু বিছানা ঠিক করে দিতে দিতে চাপা স্বরে বললে,—ঘড়ি ধরে ঠিক একটার সময় জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে একবার টর্চের আলো ফেলে নিভিয়ে দেবেন। আমি নীচে চারজন লোককে সামলাচ্ছি।

আজ আপনি রাত্রে পাহারায় থাকবেন নাকি ? [পৃষ্ঠা ৬৫২

সমরু আর সময় নষ্ট না করে নীচে নেমে গেল। পাঁচ মিনিটের বেশী সে দেরি করেনি। ও বাড়িতে চারজন সশস্ত্র প্রহরী থাকে। রোজ রাত্রে দুজন একসাথে পাহারা দেয় পালা করে। চারজন ছাড়া আর কোন লোক থাকে না। চারজনই হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের বিখ্যাত খুনে গুণ্ডা। ওরা পারে না এমন কাজ দুনিয়ায় নেই। বিশেষ করে ঐ সরখেল লোকটা সাংঘাতিক ধরনের।

সমরু নীচে নেমে গিয়ে দেখল চারজন প্রহরী কফি গিলে নেশায় বুঁদ হয়ে টলছে। স্ট্রং ব্রোমাইড খাওয়ামাত্র শরীরের প্রত্যেকটি নার্ভ শিথিল হয়ে আসে। তখন নেশাখোরের মতই টলতে থাকে। তারপর আর কোন জ্ঞান থাকে না।

সমরু মনে মনে হাসল। না আর দেরি করা চলে না। নীচের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই দেওয়াল ঘড়িতে রাত একটা বাজল।

সমরু দৌড়ে ওপরে গিয়ে দেখল রমাশঙ্করবাবু খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে টর্চের আলো ফেলছেন।

সমরু নীচে নেমে গেল। তার যেন আর তর সইছে না। বাড়ির গেটটা বন্ধ ছিল। সমরু সন্তর্পণে ছুটে গেল গেটের কাছে। ভেতর থেকে গেটে তালা দেওয়া। সমরু কি করবে ভাবছে এমন সময় গেটের ওপাশ থেকে প্রফেসর সেনের চাপা স্বর ভেসে এল।

—সমরু !

—হ্যাঁ বাবু আমি।

—গেটের চাবি কার কাছে ?

—প্রহরীদের কাছে আছে বাবু। ওরা কফি খেয়ে ঢুলছে। আপনারা গেট টপকে আসুন। কোন ভয় নেই।

প্রফেসর সেন আর মণিশঙ্কর গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ভ্রমর সিং আর সুরেশের বাড়ির পিছন দিক থেকে বাগানের পাঁচিল টপকে ভেতরে প্রবেশ করার কথা।

ঠিক এই সময় সুরেশ সাংকেতিক মারফত সংকেত পাঠাল যে ওরা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রফেসর সেন মনে মনে হেসে মনিশঙ্করকে বললেন,—ভেতরে যেতে পার।

আদেশ পাওয়ামাত্র মণিশঙ্কর গেট টপকে ভেতরে নামল। এদিকে প্রফেসর সেন সুরেশকে সাংকেতিক মারফত খবর পাঠালেন যে তোমরা গেটের কাছে এগিয়ে এস।

খবরটা পাঠিয়ে প্রফেসর সেন গেট অতিক্রম করে ভেতরে লাফিয়ে পড়লেন। না সমরুকে সন্দেহ করার কিছু ছিল না। ওঁরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সমরু ফিসফিস করে বললেন,—বাবু, ওরা কফি খেয়ে ঢুলছে।

—আর ঢুলবে না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে।

এর মধ্যে ভ্রমর সিং আর সুরেশ এসে পড়ল। ওরা পাঁচজনে নিঃশব্দে শিকারী বিড়ালের মত এগিয়ে গেল।

সমরু মিথ্যা বলেনি। ওরা গিয়ে দেখল চারজন সশস্ত্র প্রহরী চেয়ারে ঢলে পড়েছে। ওদের মুখগুলো মৃতের মত ফ্যাকাশে লাগছে। নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে, ঘন ঘন।

প্রফেসর সেন মুচকি হেসে চারজন প্রহরীকে চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন। ইতিমধ্যে সমরু ছুটে ওপরে গিয়ে রমাশঙ্করবাবুকে ডেকে নিয়ে এল।

রমাশঙ্করবাবু নীচে নেমে এসে সর্বপ্রথমে মণিশঙ্করকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাশ্রুনেত্রে বললেন,—আমি জানতাম তুই ঠিক সময়ে আমাকে উদ্ধার করতে আসবি। ওরে তোর ঋণ যে আমি ইহজীবনে শোধ করতে পারব না।

মণিশঙ্কর যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। প্রায় বছরখানেক হল সে তার কাকামণিকে দেখেনি। এই একবছরের মধ্যে একি চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। চেনাই যায় না। কত

বুড়ো হয়ে গেছেন। কাকামণি চিরকালই একটু অ্যাবনর্মাল। মাথায় বড় বড় চুল, দাড়ি গোঁফ চিরকাল দেখে এসেছি। কিন্তু ইদানীং যেন চেহারা আরও পাকিয়ে গেছে। কণ্ঠস্বর চাপা খসখসে হয়ে গেছে। চোখ বসে গেছে। তাই বোধহয় নাকটা আরও খাড়াই লাগছে। রমাশঙ্করবাবু বরাবরই মাঝারি আকারের ছিলেন কিন্তু রোগা হয়ে যাওয়ায় তাঁর শরীরটা যেন সামনের দিকে আরও ঝুঁকে পড়েছে।

মণিশঙ্কর কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল। রমাশঙ্করবাবু বোধহয় কিছু অনুমান করে থাকবেন। তাই আহত কণ্ঠে বললেন, কি রে তুই অমন আড়ষ্ট হয়ে গেলি কেন বাবা। তুই কি আমাকে চিনতে পারছিস না।

—চিনতে কেন পারব না কাকাবাবু। চিনতে ঠিকই পেরেছি, কিন্তু আপনার একি চেহারা হয়েছে।

রমাশঙ্করবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—চেহারার আর কি দোষ আছে। শয়তান সংগ্রাম সিং আমাকে দশদিন অন্ধকারে বন্ধ করে রেখে কম অত্যাচার করেছে। ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালা আমাকে স্লো পয়জন করে মারার জন্যে কম ইনজেকশন দিয়েছে। উঃ! মানুষ যে মানুষের ওপর এমন অকথ্য অত্যাচার করতে পারে তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝবে।

প্রফেসর সেন আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। বললেন,—পরে সব কথা শুনবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়াই মঙ্গল; চটপট আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্তরগুলো গুছিয়ে নিন রমাশঙ্করবাবু।

—আমার কিছু নেবার নেই। কাগজপত্তর যা ছিল পুড়িয়ে দিয়েছি। এমন কি শিলালিপিটাও অকেজো করে দিয়েছি। ওটা পড়ে কেউ আর সুলতান ফিরোজ শাহের গুপ্ত গুহার সন্ধান করতে পারবে না।

—সেকি মশাই, যার জন্যে এত কষ্ট করলেন সেইটেই নষ্ট করে দিলেন।

রমাশঙ্করবাবু হেসে বললেন,—আমার মগজটা তো নষ্ট করিনি প্রফেসর সেন। বেগমের সাংকেতিক ভাষা কিছুটা মগজে আর কিছু আমার ডায়েরীতে গেঁথে রেখেছি। দুটো একসঙ্গে না পেলে কেউ কিছুই করতে পারবে না।

মণিশঙ্কর বললে,—আপনার ডায়েরী সংগ্রাম সিংয়ের লোক চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যগুণে সেটা আমরা ফিরে পেয়েছি।

রমাশঙ্করবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—যাক তাহলে আমার আর কিছু নেবার নেই। চলুন কোথায় যেতে হবে।

প্রফেসর সেন বললেন,—আজ রাত্রেই আমরা হায়দ্রাবাদ ছেড়ে যেতে চাই।

—কিসে যাবেন ?

—মটরে যাব হায়দ্রাবাদ। সেখান থেকে চাটার্ড প্লেনে ফিরে যাব কলকাতা। কিন্তু মনে রাখবেন রমাশঙ্করবাবু, সংগ্রাম সিংয়ের হাত অনেক লম্বা। সহজে সে আপনাকে ছেড়ে দেবে না। হয়তো কলকাতায় গিয়েও হামলা করতে পারে। তার জন্যে আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

রমাশঙ্করবাবু হেসে বললেন,—আপনি আমার পাশে থাকলে হাজারটা সংগ্রাম সিং এলেও আমি ভয় পাব না।

সেকথা শুনে প্রফেসর সেন খুশী হয়ে রমাশঙ্করবাবুর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন,—তাহলে আজ থেকে আমরা দুজনে বন্ধু।

রমাশঙ্করবাবু হেসে বললেন,—আজকের এই শুভদিন আজীবন মনে রাখব।

* * *

(ক্রমশঃ)

ছবিতে কি তফাত বল তো ?

বলতে পার পাশাপাশি দুটো ছবির মধ্যে কি তফাত আছে ?

(না পারলে ৬৮৯ পৃষ্ঠায় দেখ।)

দেবগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

৮

হায়দ্রাবাদে যা ঘটেছিল তার জের সেইখানেই যদি শেষ হত তাহলে কলকাতার বেলেঘাটায় সেদিন রাত্রে অমন একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটত না।

বেলেঘাটায় রমাশঙ্করবাবুর পৈতৃক ভিটে। বাড়িটা বহু পুরানো আমলের। শোনা যায় এক কালে বাড়িটা নাকি কোন এক প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের বাগানবাড়ি ছিল।

প্রায় আড়াই বিঘে জমির ওপর বাগান দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। বর্তমানে সংস্কারের অভাবে ভেঙ্গেচুরে বালি চুন খসে পড়ে ভুতুড়ে বাড়ির আকার নিয়েছে।

ঐ বাড়িতে মণিশঙ্করও থাকত না। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব নিয়ে পিকনিক করতে যেত। বাড়িটার চারপাশে মস্ত বাগান। বাগানে সবজি লাগান হয়েছে। একজন মাইনে করা উড়িয়া মালী থাকে, দেখাশোনা করে।

কলকাতায় ফিরে রমাশঙ্করবাবু কিছুতেই মণিশঙ্করের সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থাকলেন না। নিজের পৈত্রিক ভিটেতে থাকবেন মনস্থ করলেন।

প্রফেসর সেন বাড়িটা দেখেশুনে বললেন,—আপনার এ বাড়ির ঠিকানা সংগ্রাম সিং জানে ?

—না। তার জানবার কথা নয়। তবে স্বয়ং নিজামবাহাদুর জানেন।

—নিজামবাহাদুর জানলে ক্ষতি নেই কিন্তু তার সাঙ্গোপাঙ্গরা জানলে সংগ্রাম সিংহ খোঁজ পেতে পারে।

রমাশঙ্করবাবু চিন্তিত হলেন।

প্রফেসর সেন বললেন,—অবশ্য আপনি এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও থাকলে যে সংগ্রাম সিং খোঁজ পাবে না এমন কথা আমি হলপ করে বলতে পারি না। সে যে ধরনের লোক শুনলাম তাতে সহজে সে হাল ছেড়ে দেবে বলে তো মনে হয় না। তাকে আসতেই হবে।

রমাশঙ্করবাবু একটু দমে গিয়ে বললেন,—তাহলে আপনার বাড়িতে গিয়ে থাকাই সবচেয়ে সেফ।

—হয়তো বা। কিন্তু আপনাকে আমার বাড়িতে গিয়ে থাকতে আমি বলবো না। তার চেয়ে এই বাড়িতে থাকা ভাল। আপনাদের কার কি মত আমি জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, শত্রুপক্ষকে কখনই একটা বিশেষ বাড়ির ওপর নজর রাখার সুযোগ দিতে নেই। আমি যেখানে থাকি, সুরেশ সেখানে থাকে না। আবার আপনি যেখানে থাকেন সেখানে মণিশঙ্কর কিংবা ভ্রমর সিং সেখানে থাকে না। অথচ আমাদের মধ্যে যোগাযোগ সব সময় আছে এবং থাকবে। একজন আক্রান্ত হলে যাতে বাইরে থেকে আমরা বাকি চারজনে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। আমার মনে হয় এইটেতেই আমাদের বেশী সুবিধে।

মণিশঙ্কর বললে,—কিন্তু আমাকে কাকামণির সঙ্গে থাকতেই হবে। একা সমরুর ওপর এ দেশে নির্ভর করা ঠিক নয়। যা দিনকাল পড়েছে। এ পাড়ার সবাই আমাকে ভালরকম চেনে। আমার একটা ডাকে পাঁচটা লোক ছুটে আসবে।

রমাশঙ্করবাবুর তাতে মোটেই আপত্তি ছিল না। মণিশঙ্করকে ছেড়ে তিনি তো থাকতে চাইছিলেন না।

* * * *

প্রফেসর ত্রিদিব সেন একজন প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক। রমাশঙ্করবাবু না চাইলেও তিনি কোন মতে বিখ্যাত সেই শিলালিপিটি ফেলে আসেন নি। সেটা যত্ন করে নিয়ে এসে জাদুঘরে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে রেখে দিয়েছিলেন।

রোজই এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে রমাশঙ্করবাবুর আলোচনা হয়। শিলার ওপর খোদাই করা সাংকেতিক ভাষা কিভাবে বিকৃত করেছেন দেখালেন। কি ছিল আর কি করা হয়েছে।

তারপর শুরু হল গভীর আলোচনা। ইতিহাসকে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে ওঁরা দুজনে পোস্টমর্টেম করতে লাগলেন। সুলতানা ফিরোজ শাহ, আহম্মদ শাহ, আসমানী বেগম আর সেই পার্শ্বচরটি যার নাম ইতিহাস মনে রাখেনি—এই চারজনকে নিয়ে চুলচেরা বিচার হল।

দেখা গেল আসমানী বেগম ছিলেন পারস্য দেশের কোন এক সুলতানের হারেমে। সেখান থেকে কি করে কেমন করে তিনি বাহমনী রাজ্যে এলেন কেউ জানে না।

এইটুকু উদ্ধার করতে পারলেই আমাদের ম্যাপ পূর্ণ হবে। [পৃষ্ঠা ৭০৯

আসমানী বেগম পারস্যের নারী। তাই তাঁর সাংকেতিক ভাষা জানা খুব স্বাভাবিক। শিলায় যে ভাষা আছে তার সঙ্গে পারস্য দেশের ভাষার কিছু মিল আছে।

রমাশঙ্করবাবু সাংকেতিক ভাষার অর্থ করলেন এইভাবে···

পর্বত যেখানে শুরু আর যেখানে শেষ।
চারের এক সেইখানেই শুরু কর।
যে ভাগ্যবান, তাকে বলি মন দিয়ে শোন,
অন্ধকারে কানা গলি ধরে চলতে শুরু কর।
খোদা যেখানে শেষ সীমানা টেনেছেন
ঠিক তারই নীচে আছে মূর্খের কবর।
যদি তুমি বুদ্ধিমান হও তবে রাজ্য ছেড়ে
আমার আঁকা চিহ্নগুলো সাজিয়ে নিয়ে
সুলতানের অনুগামী হও। রত্ন সিংহাসন তোমারই।···বেগম

রমাশঙ্করবাবু সাংকেতিক ভাষার অর্থ করে শোনাতে প্রফেসর সেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। রমাশঙ্করবাবু বললেন,—এই কটি কথার মধ্যে আসমানী বেগম একটা ম্যাপ এঁকে দিয়েছেন লক্ষ্য করেছেন।

প্রফেসর সেন হাঁ না কোন উত্তর দিলেন না।

রমাশঙ্করবাবু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,—কি বুঝতে পারছেন না ?

প্রফেসর সেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন,—কিছুটা নিশ্চয়ই বুঝেছি কিন্তু আমার মনে হয় আপনি সব কথা পরিষ্কার করে বলেন নি। আরও আছে—

রমাশঙ্করবাবু হেসে বললেন,—আছে আছে আরও আছে। আমি সবটা বুঝিনি তাই আপনাকে বলিও নি। এইটুকু উদ্ধার করতে পারলেই আমাদের ম্যাপ পূর্ণ হবে।

—তার মানে আপনি এখনও চিহ্নগুলো পর পর সাজিয়ে নিতে পারেন নি।

—ঠিক বলেছেন। এই চিহ্নগুলো পর পর সাজান বড় কঠিন। আমি জানতে চাই এই চিহ্নগুলোর বিশেষ কোন অর্থ আছে কি না।

—দেখি আসল চিহ্নগুলো কি রকম।

—এই দেখুন।

রমাশঙ্কর তাঁর ডায়েরীর প্রত্যেক পাতার নীচে এক একটা চিহ্ন এঁকে রেখেছিলেন। সেগুলো পর পর সাজালে এই রকম দেখায়—

প্রফেসর সেন গভীর মনোযোগ দিয়ে চিহ্নগুলো দেখতে দেখতে এক সময় বলে উঠলেন, —রমাশঙ্করবাবু আমার মনে হচ্ছে বেগমসাহেবার মনোভাব আমি কিছুটা বুঝেছি।

—বুঝেছেন ?

—হ্যাঁ বুঝেছি। আচ্ছা আপনি তো ইতিহাস পড়েছেন। বলতে পারেন আসমানী বেগম কি শিল্পের অনুরাগী ছিলেন ?

রমাশঙ্কর বললেন,—আসমানী বেগম সম্বন্ধে ঠিক তেমন কোন কথা লেখা নেই। তবে নিকিতিনের বিবরণে আছে সুলতান ফিরোজ শাহ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে দেশে শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের মর্যাদা ছিল।

—এটুকুই যথেষ্ট। আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। রমাশঙ্করবাবু, আপনি ম্যাপ এঁকে ফেলুন, স্পটে গিয়ে এই চিহ্নগুলো পর পর সাজিয়ে ফেলতে আমাদের বেগ পেতে হবে না।

প্রফেসর সেন আর বিশেষ কিছু বলতে চাইলেন না। একটা কাগজে চিহ্নগুলো এঁকে নিয়ে ফিরে গেলেন।

* * *

রমাশঙ্করবাবুর বাড়িতে টেলিফোন ছিল না।

অগত্যা মণিশঙ্কর তার ভাড়া বাড়ি থেকে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করল। টেলিফোন কোম্পানি যেদিন টেলিফোন দিয়ে গেল সেদিনই টেলিফোনটা রাত একটা নাগাদ ঝনঝন করে বেজে উঠল।

মণিশঙ্কর রাত দশটার পরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে ছিলেন শুধু রমাশঙ্করবাবু। প্রফেসর সেনের কথামত তিনি ম্যাপটা কাগজে এঁকে ফেলছিলেন। সব কাজ শেষ করেছেন এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেলিফোন বেজে উঠতে রমাশঙ্করবাবু রিসিভার তুললেন।

—হ্যালো, কে কথা বলছেন ?

ওপাশ থেকে একটি নারীকণ্ঠ ধ্বনি তুলল,—আচ্ছা এটা কি মণিশঙ্কর চাটুয্যের বাড়ি ?

রমাশঙ্করবাবু বললেন,—হ্যাঁ। আপনার নাম ?

—নীনা সরখেল। আচ্ছা আপনি মণিশঙ্করের কে হন ?

—আমি তার কাকা।

—ও আপনার নাম বুঝি রমাশঙ্করবাবু—

—হ্যাঁ। তোমার নাম যদি নীনা সরখেল হয় তবে তুমি তো আমাকে ভাল করেই চেন।

—হ্যাঁ চিনি, সেই জন্যেই তো আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা জানতে চাইছি।

—কেন ? কি দরকার !

—আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—কি ব্যাপারে বল ?

—সে কথা টেলিফোনে বলা যায় না। আপনার সামনে আমি মণিশঙ্করকে বলবো। কাল সকালেই যাব। আমার সঙ্গে কেউ থাকবে না। আমি একা যাব।

—বেশ তো আমার আপত্তি নেই।

—তাহলে দয়া করে ঠিকানাটা বলুন।

রমাশঙ্করবাবু ঠিকানাটা বলে দিতেই নীনা সরখেল বললে,—এইবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন।

মনে হল মেয়েটি অন্য কাউকে রিসিভার ছেড়ে দিল। কেন না পরক্ষণে ভেসে এল এক পুরুষ কণ্ঠ।

—নমস্কার বাবুজী, আমাকে চিনতে পারছেন—

—কে ?

রমাশঙ্করবাবু আঁতকে উঠলেন। হাত কেঁপে উঠল।

পাশের পুরুষ কণ্ঠ হেসে ওঠে—কি হল বাবুজী আঁতকে উঠলে কেন ? তোমার কি ধারণা আমি কবরের নীচে থেকে কথা বলছি।

—তুমি—

—হ্যাঁ আমি বেঁচে আছি। বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি জান ? না আর কোন সুযোগ

তুমি পাবে না! নীনা তোমার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেও আমি তোমার ঠিকানা আগে থেকে জানতাম। আর এতক্ষণ বোধহয় লোকজন নিয়ে ডাক্তারবাবু তোমার সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্যে রওনা হয়ে গেছে। আমি কাপুরুষের মত যুদ্ধ করি না তাই আগে থাকতে তোমাকে জানিয়ে দিলাম। গুড নাইট্—

লাইন কেটে দিল সংগ্রাম সিং।

রমাশঙ্করবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তখুনি প্রফেসর সেনকে টেলিফোন করলেন,—হ্যালো প্রফেসর। শুনুন এইমাত্র সংগ্রাম সিং টেলিফোন করেছিল! সে দলবল নিয়ে আসছে—না না এসে পড়েছে। ঐ শুনুন দরজায় লাথি মারছে। পুরানো দরজা এক্ষুণি ভেঙে পড়বে।

পিস্তল নিয়ে···গুলি চালাতে লাগলেন। [পৃষ্ঠা ৭১১

প্রফেসর সেন বললেন,—আপনি ভয় পাবেন না আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। খুব জোর কুড়ি মিনিট—যুদ্ধ চালিয়ে যান।

রমাশঙ্করবাবু রিসিভার ছেড়ে দিলেন। ইতিমধ্যে মণিশঙ্কর আর সমরুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সদর দরজায় ঘা পড়ছে। সমরু ভাবল তাদেরই কেউ এসেছে। ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

সেই সময় রমাশঙ্করবাবু চিৎকার করে উঠলেন,—মণি, দরজা খুলতে নিষেধ কর। ওরা সংগ্রাম সিংয়ের লোক।

তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। সমরুকে ওরা সামনে পেয়েই খুন করল। রমাশঙ্করবাবু মণির ঘরের দিকে যেতে গিয়ে পারলেন না। মণির সঙ্গে তখন ওদের রীতিমত গুলি বিনিময় শুরু হয়ে গেছে। ওরা সংখ্যায় ছিল চারজন।

রমাশঙ্করবাবু তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে পিস্তল নিয়ে এসে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগলেন।

এই সময় মণিশঙ্কর চিৎকার করে বললে,—কাকামণি আপনি পালান, আমি এদের আটকে রাখছি।

কথাটা বলতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল সে। আর তারই ফলে একটা বুলেট এসে লাগল তার দেহে। মণিশঙ্কর আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।

রমাশঙ্করবাবু বুঝলেন একমাত্র পালানো ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই। বুদ্ধি করে তাই তিনি বাথরুমের মধ্যে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলেন। শত্রুপক্ষ চড়াও হল। তারা বাথরুমের দিকে যাবার আগেই রমাশঙ্করবাবু বাথরুমের ভাঙা জানলা টপকে বাগানের অন্ধকারে অদৃশ্য হলেন।

এই বিপদের মধ্যেও রমাশঙ্করবাবু ম্যাপটার কথা ভোলেন নি। বাথরুমে পালাবার আগে ম্যাপ সমেত ডায়েরীটা নিয়ে গিয়েছিলেন।

গুলির আওয়াজে পাড়ার লোকেরা জেগে উঠেছিল। রমাশঙ্করবাবু বাগানের পাঁচিল টপকে পথে পড়তেই পোস্ট অফিসের লাল রঙের লেটার বক্সের ওপর নজর পড়ল। চট্ করে মগজে বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাড়াতাড়ি ম্যাপটা আর ডায়েরীটা লেটার বক্সে পোস্ট করে দিলেন।

এর পরের ঘটনা কাহিনীর শুরুতেই জানিয়েছি। প্রফেসর সেন এসে রমাশঙ্করবাবুকে অপমৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে।

(ক্রমশঃ)

বলতে পার?
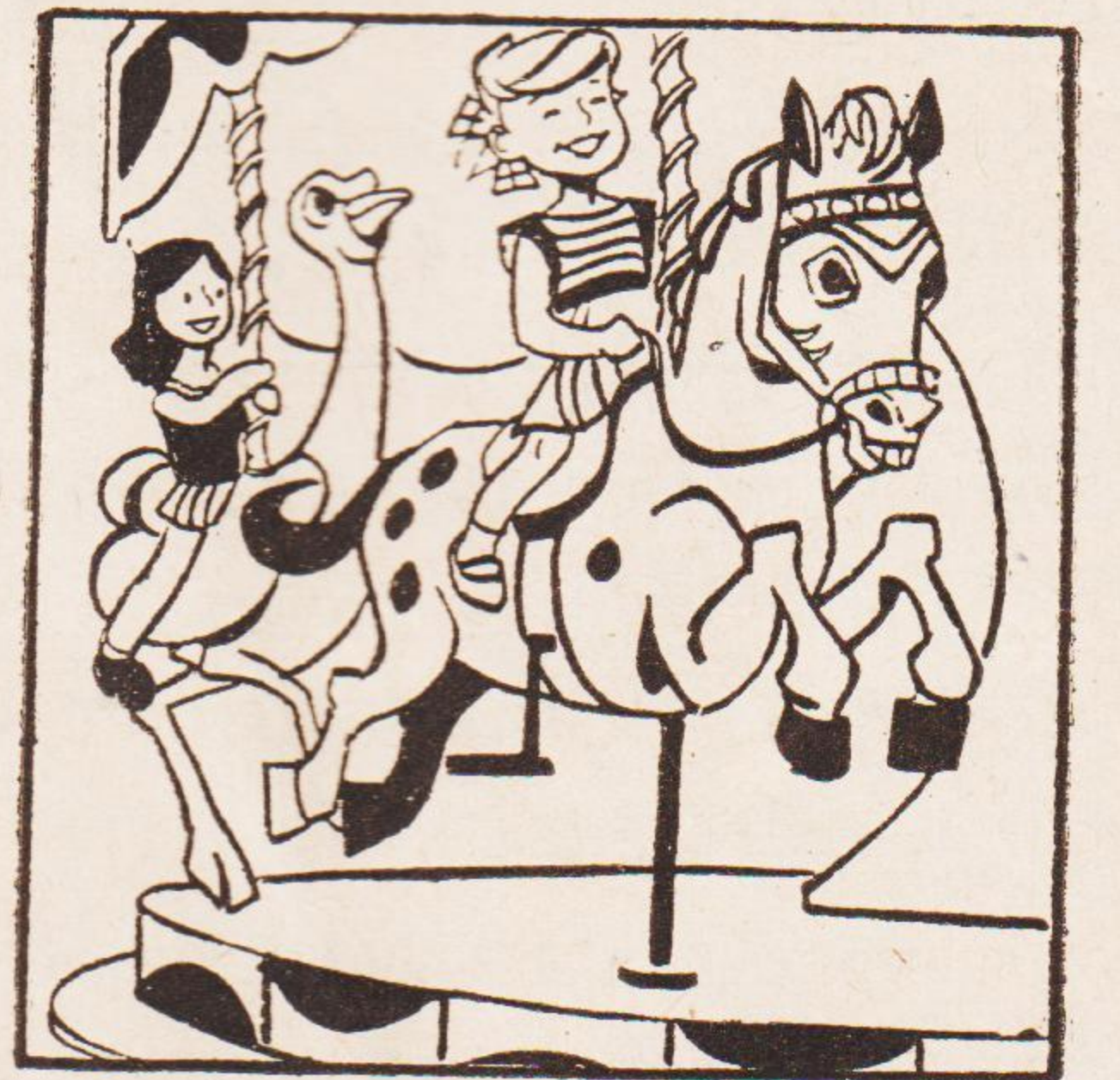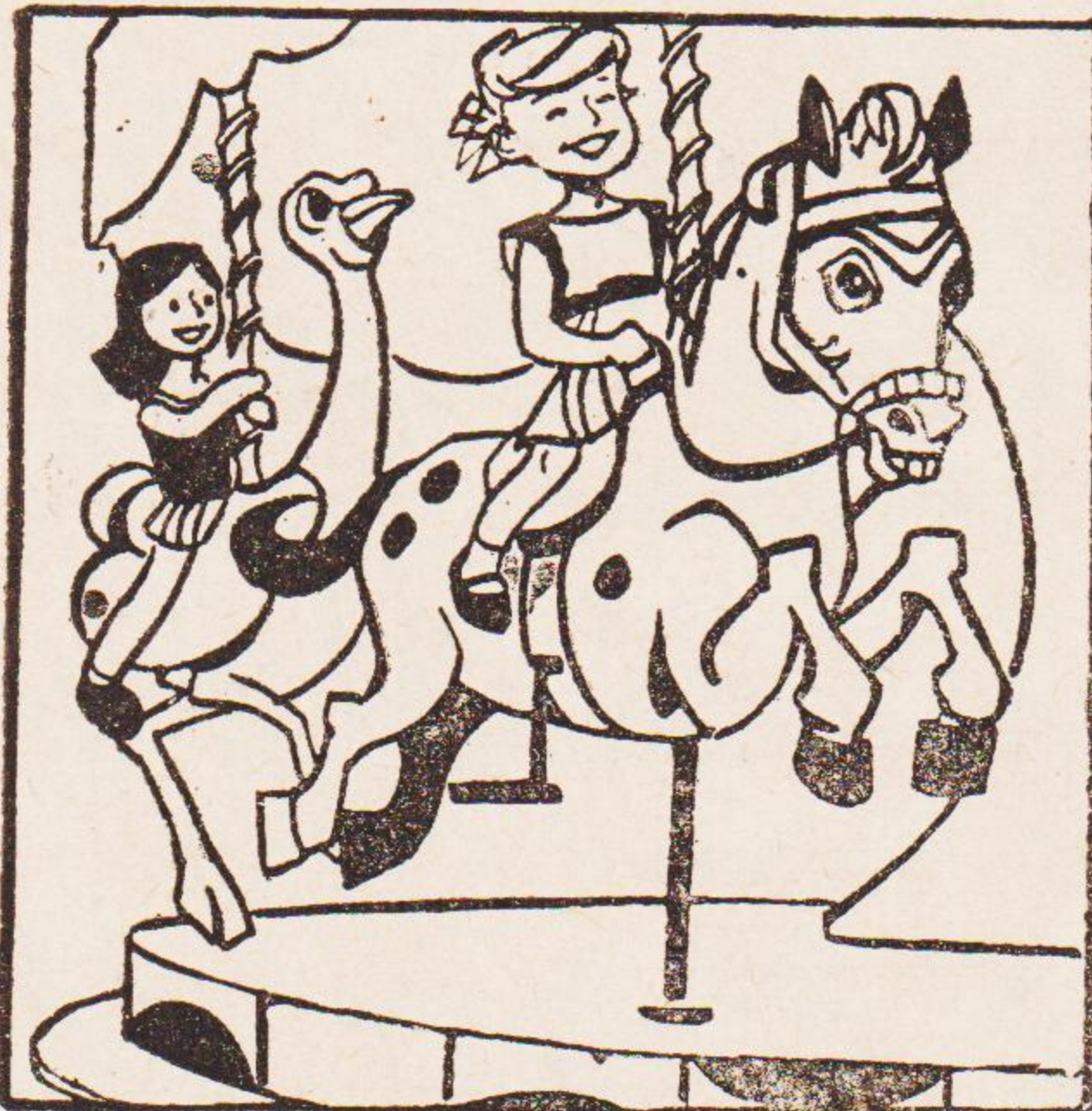
(না পারলে ৭১২ পৃষ্ঠায় দেখ)

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

৯

পরের দিন সকালে দৈনিক কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হল গত রাত্রের ঘটনা।

একদল সশস্ত্র ডাকাত গত রাত্রে শ্রীরমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি চড়াও হয়। ডাকাতদলের গুলিতে শ্রীরমাশঙ্করের ভাইপো শ্রীমণিশঙ্কর আহত হয়েছে এবং সমরু নামক ভৃত্য নিহত হয়েছে। শ্রীমণিশঙ্করকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এই ঘটনায় পুলিস কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ গলির মুখে গত রাত্রে রীতিমত বন্দুকের লড়াই হয়ে গেছে। একটা কালো অ্যামবাসাডর অকুস্থলে পাওয়া গেছে। গাড়ির ড্রাইভারের মগজ বুলেটের আঘাতে গুঁড়িয়ে গেছে। ড্রাইভারকে এদেশী লোক বলে মনে হয় না। ড্রাইভারের পকেটে হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের ঠিকানা পাওয়া গেছে। পুলিসের সন্দেহ একদল ডাকাত উক্ত গাড়িতে ছিল। কার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হল, কার গুলিতে ড্রাইভার নিহত হয় পুলিস এখনও জানতে পারেনি।

পুলিস রমাশঙ্করবাবুর খোঁজ করছেন। তিনি নিখোঁজ। গত রাত্রে তিনি বেলেঘাটায় ছিলেন বলেও মনে হচ্ছে না। শ্রীমণিশঙ্করবাবু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বোঝাও যাবে না। জোর পুলিসের তদন্ত চলছে।......ইত্যাদি—

গত রাত্রে সুরেশকে প্রফেসর সেন টেলিফোনে সবই জানিয়ে বলেছিলেন,—আপাততঃ আমাদের করার কিছুই নেই। রমাশঙ্করবাবু খুবই মুষড়ে পড়েছেন। আমি তাঁকে নিয়ে

ব্যস্ত আছি। তুমি এক কাজ কর ভোর ছটার সময় বেলেঘাটায় রমাশঙ্করবাবুর বাড়ির কাছে লেটার বক্সের পাশে গিয়ে অপেক্ষা কর। ৬-৩০ মিনিটে পোস্ট অফিসের পিওন আসবে লেটার বক্স খুলে চিঠি নেবার জন্যে। তুমি পিওনকে বলবে গতকাল রাত্রে গণ্ডগোলের সময় তুমি তোমার ডায়েরী আর একটা কাগজ ভয় পেয়ে লেটার বক্স-এ পোস্ট করে পালিয়েছিলে। মোট কথা, যেমন করে পার ঐ দুটো জিনিস নিয়ে সোজা আমার বাড়িতে চলে আসবে।

সেই মত সুরেশ প্রথমে বেলেঘাটার পুলিস স্টেশনে যায়। সেখানে তার এক বন্ধু কাজ করে। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বেলেঘাটার যথাস্থানে। ঠিক ৬-৩০ মিঃ পিওন এল পোস্ট বক্স ক্লিয়ার করতে।

সঙ্গে পুলিস ছিল বলে পিওন আপত্তি করেনি। ডায়েরী আর ম্যাপ আঁকা কাগজটা সুরেশকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

সুরেশ সোজা ফিরে আসে যোধপুর পার্কে, প্রফেসর ত্রিদিব সেনের বাড়িতে। ডায়েরী আর ম্যাপটা ফিরে পেয়ে প্রফেসর সেন খুব খুশী হলেন।

সুরেশ বললে,—স্যার পুলিস রমাশঙ্করবাবুর স্টেটমেন্ট নেবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এই সময় ওঁনার কি চুপচাপ বসে থাকা উচিত।

প্রফেসর সেন বললেন,—উচিত নয় জানি। আজই রমাশঙ্করবাবু পুলিস কমিশনারের সঙ্গে লালবাজারে গিয়ে দেখা করবেন। ওঁর সঙ্গে আমিও থাকব। আমাদের গাড়ি তুমি আর ভ্রমর সিং ফলো করবে। আমি সংগ্রাম সিংকে বিশ্বাস করি না। সে এখন মরিয়া। যদি কোন গাড়িকে বেপরোয়াভাবে আমাদের গাড়িকে চার্জ করতে দেখ তখনই গুলি চালাবে। এতটুকু হেজিটেট্ করো না।

—রাইট স্যার।

—আমরা রওনা হব বেলা দশটায়।

ডায়েরী আর ম্যাপটা রমাশঙ্করবাবুকে ফেরত দিতে গেলেন প্রফেসর সেন। রমাশঙ্করবাবু নিলেন না। প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন,—না না ওসব আমার আর দরকার নেই মশাই। ম্যাপ আমি শেষ করে দিয়েছি। আর আমার কিছু করার নেই। এবার ওটা আপনার কাছেই রাখুন।

প্রফেসর সেন গম্ভীর হয়ে বললেন,—তার মানে আপনি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

—না প্রফেসর ভয়ে নয়, ঘৃণায়। ঐ দুটো জিনিসের জন্যে আমি সমরুকে হারালুম, হয়তো মণিকেও হারাতে হবে। প্রফেসর, দুনিয়ায় ঐ মণি ছাড়া আমার আর কে আছে বলতে পারেন। রত্ন সিংহাসন উদ্ধার করে আমার লাভ। ওটা জাতীয় সম্পত্তি। সুতরাং

শিলালিপির সাংকেতিক ভাষা আর যা যা আমি পেয়েছি সবই আপনাকে বুঝিয়ে দেব। আপনি যদি পারেন উদ্ধার করুন। রমাশঙ্করবাবু নিস্তেজ কণ্ঠে কথাগুলো বলে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন।

প্রফেসর সেন বললেন,—রামাশঙ্করবাবু আপনি হাল ছেড়ে দিলেও সংগ্রাম সিং আপনাকে ছেড়ে দেবে না। যেখানেই থাকুন, আপনাকে খুঁজে বের করে চরম প্রতিশোধ সে নেবেই।

—প্রতিশোধ কেন নেবে। আমার অপরাধ—

—অপরাধ। অপরাধ আপনি রত্ন সিংহাসনের হদিস জানেন। সংগ্রাম সিং রত্ন সিংহাসন পেলেও আপনাকে হত্যা করবে না পেলেও করবে। রমাশঙ্করবাবু কাপুরুষের মত মার খেয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধ করে মরা অনেক ভাল। তাছাড়া আপনি শিক্ষিত। জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা, আপনার মত লোকের পবিত্র কর্তব্য হওয়া উচিত।

—অপরাধ। অপরাধ আপনি রত্ন সিংহাসনের হদিস জানেন।

রমাশঙ্করবাবু প্রতিবাদ করতে পারলেন না। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

* * * *

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রফেসর সেন রমাশঙ্করবাবুকে নিয়ে লালবাজারে গিয়ে হাজির হলেন। ওদের গাড়িটা থানার গেটের মধ্যে অদৃশ্য হতে সুরেশ তার গাড়িটা ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড় করাল।

সেদিন ছিল রবিবার। পথে মোটে ভিড় ছিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চারপাশে নজর রাখতে লাগল।

লালবাজার থানার বিপরীত ফুটপাতের ওপর একজন ফলওয়ালা আগে থেকেই ফল বিক্রি করছিল। প্রফেসর সেনের গাড়িটা দেখেই লোকটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপরই সুরেশের গাড়িটা থানার পাশে ফুটপাতের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে লোকটা সন্দেহজনকভাবে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল।

সুরেশের সঙ্গে চোখাচোখি হতে লোকটা থতমত খেয়ে চোখ ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকাতে থাকে। সুরেশের হঠাৎ মনে হল ফলওয়ালাকে সে যেন কোথায় দেখেছে! কিন্তু কোথায়, কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।

গাড়ির ভিতরে বসেছিল ভ্রমর সিং। সুরেশ ফলওয়ালার ওপর নজর রেখে বিড়বিড় করে ভ্রমর সিংকে বললে—ভ্রমর সিং ঐ ফলওয়ালার মুখটা ভাল করে দেখ ত। ওকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

ভ্রমর সিং তাকাল। ওর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। ভাল করে দেখে বললে,—হ্যাঁ আব ঠিক চিনিয়েছে। ও তো সংগ্রাম সিংকা আদমি।

সুরেশ চমকে ওঠে,—সে কি! আরে তাই তো এইবার মনে পড়েছে ঐ লোকটা রমাশঙ্করবাবুকে পাহারা দিত। আমরা তো ওকে দেবগিরিতে বেঁধে রেখে এসেছিলাম। ব্যাটাচ্ছেলে এখানে কি করছে?

—পুছবো।

—না। দেখাই যাক না লোকটা কি করে।

—কি আবার করবে। নজর রাখনে কে লিয়ে খাড়া হায়। সুরেশবাবু হামি লোকটার পিছু নেব। ও জায়গা কাঁহা—

—ভ্রমর সিং এমন কিছু করো না যাতে তোমার মনিবের কোন ক্ষতি হয়।

—কি ক্ষতি হোবে। দরকার হোলে ওর লাশ নাবিয়ে দেব।

—থাক তোমাকে আর বাহাদুরি করতে হবে না। ওদের দৌড়টা দেখা যাক।

একজন ক্রেতা ফলওয়ালার কাছে ফল কেনার জন্যে এল। সেই সুযোগে সুরেশ ভ্রমর সিংকে বলল,—ভ্রমর সিং তুমি যদি লোকটার পিছু নিতে চাও তবে এই সুযোগে গাড়ি থেকে নেমে পড়। লোকটা তোমাকে দেখতে পায়নি।

সুরেশ কথা শেষ করার আগেই ভ্রমর সিং গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সুরেশ লোকটাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে গাড়ি নিয়ে সোজা লালবাজার থানার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

লোকটা আড় চোখে তাকাল। সুরেশের গাড়িটা দেখতে না পেয়ে লোকটা একটু আশ্চর্য হল যেন। এদিক ওদিক তাকিয়েও যখন দেখতে পেল না তখন ফলের ঝুড়ি মাথায় করে থানার গেটের সোজাসুজি দাঁড়িয়ে ভেতরটা লক্ষ্য করতে লাগল।

ভ্রমর সিং এক ফাঁকে ট্রাম লাইন অতিক্রম করে লোকটার অলক্ষ্যে তার ওপর নজর রাখতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে প্রফেসর সেনের গাড়িটা থানা থেকে বেরিয়ে এল। হঠাৎ ফলওয়ালা লোকটা ফলের ঝুড়ি ফেলে ছুটে এল। তার ফতুয়ার পকেটে ছিল গ্রেনেড। লোকটা প্রফেসর সেনের গাড়ি লক্ষ্য করে যেই গ্রেনেড ছুড়তে যাবে অমনি ভ্রমর সিং বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে জোড়াপায়ে লোকটাকে এমন একটা লাথি মারল যে লোকটা লাট্টুর মত পাক খেয়ে ট্রাম লাইনের ওপর আছড়ে পড়ল সেই সঙ্গে গ্রেনেডটা তার হাতের মধ্যেই সশব্দে বিদীর্ণ হল।

থানার গেটে পাহারারত কনেস্টবলটি প্রথম থেকেই সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করেছিল। ভ্রমর সিংয়ের জন্যে প্রফেসর সেন এবং রমাশঙ্করবাবু আর একবার প্রাণে বেঁচে গেলেন।

কনেস্টবলের চিৎকারে থানার আরও কয়েকজন কনেস্টবল এবং দু'চার জন পথচারী ছুটে এসে ফলওয়ালাকে ঘিরে ধরল। সে তখন মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

ভ্রমর সিংয়ের কিছুই হয়নি। হেলতে দুলতে এসে আহত লোকটার ফতুয়া ধরে টেনে তুলে চড়া সুরে বললে,—বোল্ কোন আদমি তুমকো ভেজা থা। নেহি তো তেরা জীব খিঁচকে নিকাল লেগা। বোল—

লোকটার কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। গ্রেনেডের আঘাতে তার ডান হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মুখ, পেট, বুক কিছুই অক্ষত ছিল না।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। প্রফেসর সেন এক ফাঁকে এসে লোকটার পকেট সার্চ করে পেলেন একটা নোট বই। সকলের অলক্ষ্যে তিনি নোট বইটা পকেটস্থ করে রায় দিলেন,—হি ইজ ডেড।

লালবাজার থানাতেও হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। এমন কি পুলিস কমিশনারও ছুটে এসেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী কনেস্টবল ও পথচারীদের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি প্রফেসর সেনকে বারবার সাবধান করে দিতে লাগলেন। বললেন,—এর পর আমি আপনাদের একা ঘোরাফেরা করতে বলব না প্রফেসর। আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে দু'জন প্লেন ড্রেসে পুলিস রাখা উচিত।

প্রফেসর সেন মৃদু হেসে বললেন,—আমি নিজের শক্তির ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখি কমিশনার। তাছাড়া আমার সঙ্গে ভ্রমর সিং সব সময়েই থাকে। ও একাই এক ব্যাটালিয়ান পুলিসের কাজ করতে পারে।

প্রফেসর সেন রমাশঙ্করবাবুকে নিয়ে ফিরে এলেন তাঁর বাড়িতে। তাঁর গাড়িকে অনুসরণ করে এল সুরেশ আর ভ্রমর সিং।

* * *

রমাশঙ্করবাবু ভীতু প্রকৃতির মানুষ হলেও উক্ত ঘটনার পর প্রফেসর সেন এবং তাঁর দলবলের ওপর যথেষ্ট আস্থা ফিরে এসেছিল। তিনি বললেন,—ভেবে দেখলাম আপনার কথাই ঠিক। মার খেয়ে কাপুরুষের মত মরার চেয়ে যুদ্ধ করে মরা অনেক ভাল। মণির অবস্থায় আমি মুষড়ে পড়েছিলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন প্রফেসর সেন। সংগ্রাম সিংয়ের সঙ্গে কোন রকম কম্প্রোমাইজ করতে চাই না। এবার থেকে আত্মরক্ষা না করে আমি ওদের আক্রমণ করতে চাই। পুলিস কমিশনার যা বললেন তাতে আমরা পুলিসের সাহায্য যখন তখন পাব।

প্রফেসর সেন মৃদু হেসে বললেন,—রাইট। তবে সবার আগে সংগ্রাম সিংয়ের কলকাতার ঠিকানা আমার চাই।

বলতে বলতে তিনি ফলওয়ালা লোকটার পকেট থেকে তুলে নেওয়া নোট বইটা বের করে পাতা ওলটাতে লাগলেন।

রমাশঙ্করবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—ওটা কি?

—নোট বই। ফলওয়ালার ফতুয়ার পকেটে ছিল। দাঁড়ান দেখি এর মধ্যে কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা।

নোট বইতে ফলের হিসেব প্রভৃতি লেখা রয়েছে। কোন্ তারিখে কোথা থেকে ফল কেনা হয়েছে। সারা দিনে কত লাভ হয়েছে। মহাজনকে কত টাকা দিতে হবে, তার হিসেব বেশ পরিষ্কার উর্দুতে লেখা।
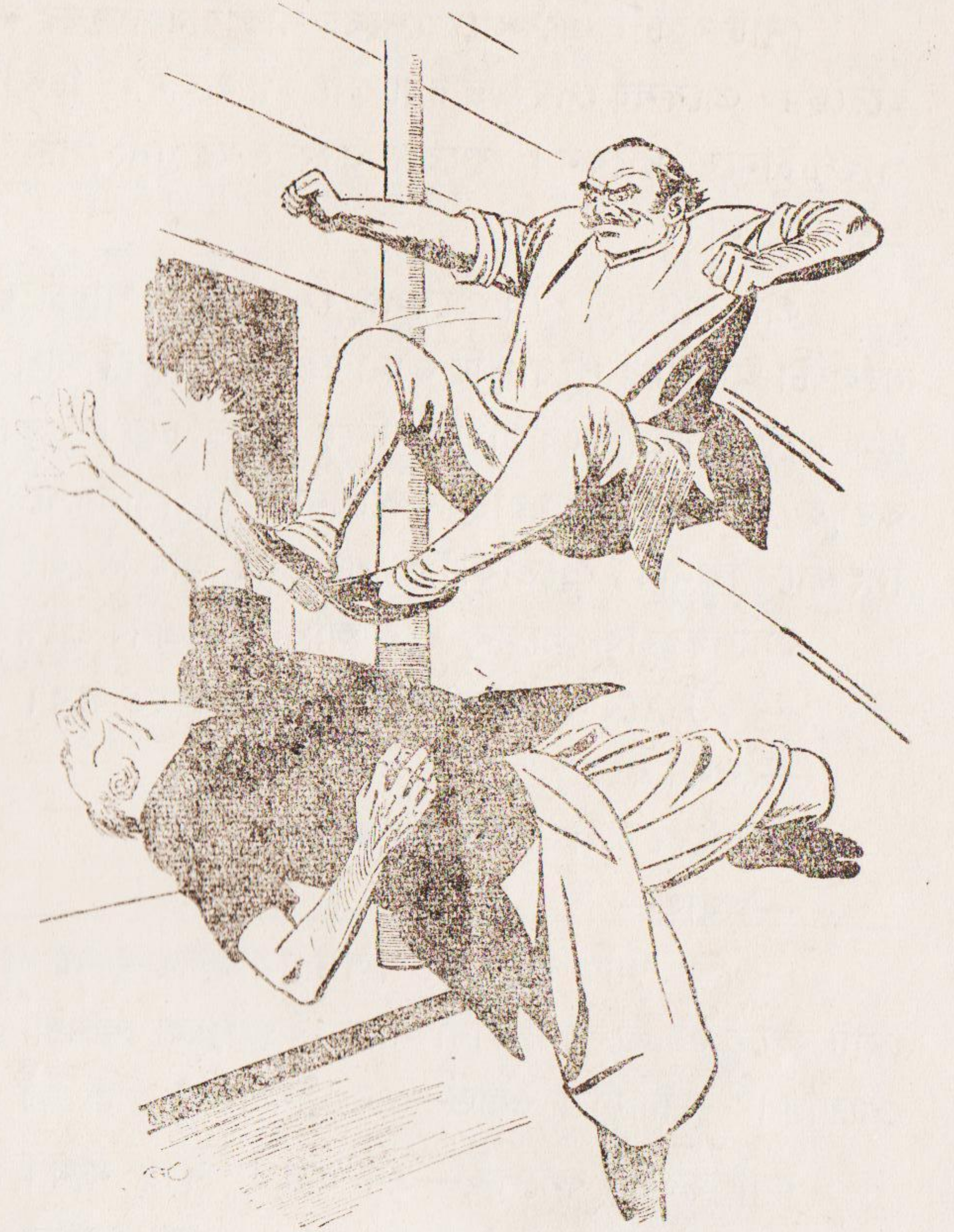
ভ্রমর সিং জোড়াপায়ে লোকটাকে এমন লাথি মারল··· [পৃষ্ঠা ৮৩৬

নোট বইটার একেবারে শেষের পাতায় মহাজনের নামের আদ্যক্ষর এবং ঠিকানা লেখা রয়েছে। প্রফেসর সেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। চিন্তা করার সময় এক নাগাড়ে তিনি পাইপ টানতে থাকেন। সুরেশ এবং ভ্রমর সিং সেটা জানে তাই সেই সময় তাঁকে কোন প্রশ্ন করে না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে প্রফেসর সেন হঠাৎ পায়চারি করতে করতে বললেন,—ওদের মতলবটা আমাদের পুরোপুরি জানা দরকার। ওরা আপনাকে খুন করতে চায়। না বেমালুম গুম করে আবার দেবগিরিতে নিয়ে যেতে চায়। কোন্‌টা। তাছাড়া আমার সম্বন্ধে ওরা কতদূর জেনেছে। আমরাই যে আপনাকে দেবগিরি থেকে উদ্ধার করে এনেছি সেটা সংগ্রাম সিং জানে কিনা। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আজ কালের মধ্যেই আমার চাই।

রমাশঙ্করবাবু বললেন,—কে আপনাকে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে ?

—কেউ দেবে না। আমাদেরই জেনে নিতে হবে।

—কেমন করে ?

—চোরের ওপর বাটপাড়ি করে।

—অর্থাৎ—

—অর্থাৎ আজ রাত্রে মৃত ফলওয়ালার মহাজনের বাড়িতে ছদ্মবেশে চড়াও হতে হবে। নোট বইতে মহাজনের ঠিকানা আছে কিন্তু পুরো নামটা লেখা নেই। শুধু নামের আদ্যক্ষর পেয়েছি। দুটো মাত্র ওয়ার্ড—এন. এস.।

রমাশঙ্করবাবু বললেন,—এন. এস.। কার নাম। সংগ্রাম সিং হলে হত এস. এস.। কিংবা ডাক্তার হলে হত পি. এস. কে.। মানে প্রেমসাগর খাণ্ডেলওয়ালা। এন. এস. বলে ওদের দলে কেউ নেই তো ?

প্রফেসর সেন হেসে বললেন,—আছে আছে রমাশঙ্করবাবু। এই এন. এস. সেদিন মাঝরাতে আপনাকে প্রথম টেলিফোন করেছিল।

রমাশঙ্করবাবু চমকে ওঠেন,—ও ইয়েস। নীনা সরখেল।

—দ্যাট্‌স্‌ রাইট। নীনা সরখেল। সংগ্রাম সিং অতি চালাক কিনা তাই নীনা সরখেলের ঠিকানাটা ব্যবহার করছে।

রমাশঙ্করবাবু বললেন,—কিন্তু ঠিকানাটা লক্ষ্য করেছেন। আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে কি।

—হয়তো হবে না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতেই হয়। আজ রাত্রে আমি একাই যাব।

প্রফেসর সেনের কথার নড়চড় হবার নয়। অসমসাহসী পুরুষ তিনি। কোনরকম বিপদকে তিনি পরোয়া করেন না। তার কিছুটা আভাস রমাশঙ্করবাবু ইতিমধ্যেই পেয়েছিলেন তাই আর তর্ক করলেন না।

ভ্রমর সিং শুধু বললেন,—আপ আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে যানে কা বাদ ম্যা দো ঘণ্টা ইঁহা রহেগা। উসকা অন্দর আপ আয়া তো আচ্ছা হ্যায়। নেহি তো হাম ছোড়েগা নেহী। উধার যায়গা দোচার লাশ গিরাকে চলে আয়গা। আপকো কুছ হুয়া তো হাম সে বুরা কোই নেহী হোগা। ইয়ে বাৎ সোচ্‌কে আপ যাঁহা খুশী যাইয়ে—

ভ্রমর সিংয়ের কথা শেষ হতেই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। প্রফেসর সেন রিসিভার তুললেন,—হ্যালো প্রফেসর সেন স্পিকিং—

ওপাশ থেকে বামাকণ্ঠে জবাব এল,—নমস্কার প্রফেসর সেন। আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম নীনা সরখেল।

(ক্রমশঃ)

বোগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি

১০

রিসিভারের মুখ চাপা দিয়ে প্রফেসর সেন রমাশঙ্করবাবুকে বললেন,—নীনা সরখেল কথা বলছে।

রমাশঙ্করবাবু সুরেশ আর ভ্রমর সিং নামটা শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

প্রফেসর সেন কথা বলতে লাগলেন,—আমার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন বলুন।

ওপাশ থেকে নীনা সরখেল ভীত কণ্ঠে বললে,—একান্তই বিপদের মধ্যে পড়ে আমি আপনার সাহায্য চাইছি প্রফেসর। আজ সকালে লালবাজার থানার সামনে একটা ফলওয়ালা খুন হয়েছে আপনি নিশ্চয় জানেন।

—হ্যাঁ জানি।

—যে লোকটা খুন হয়েছে সে আমার বড় ভাই প্রমোদ সরখেল। একজনের চক্রান্তে পড়ে দাদা নিজে মরল আমাকেও বিপদের মধ্যে ফেলে গেল। টেলিফোনে সব কথা বলার সময় নেই প্রফেসর। আমি আর্মেনীয়ান স্ট্রীট পোস্ট অফিস থেকে আপনাকে টেলিফোন করছি। এখান থেকে বেরিয়ে আমি সোজা আপনার বাড়িতে যেতে চাই।

—আপনি আমার বাড়ি চেনেন?

—চিনি না তবে ঠিকানাটা জানি।

—বেশ, চলে আসুন। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।

—ধন্যবাদ।

লাইন কেটে গেল।

প্রফেসর সেন গম্ভীর হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। রমাশঙ্করবাবু বিমূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—নীনা সরখেল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, কেন? পায়চারি করতে করতে প্রফেসর সেন বললেন,—ঠিক বুঝতে পারছি না। আজ সকালে যে লোকটা আমাদের গাড়িতে গ্রেনেড ছুড়তে গিয়ে মারা পড়ল সে নাকি নীনা সরখেলের বড় ভাই প্রমোদ সরখেল।

—কি নাম, প্রমোদ সরখেল। হায়দ্রাবাদের নিজামবাহাদুরের স্টেটের ভূতপূর্ব এডিকং হরপ্রসাদ সরখেলের ছেলে।

—আপনি চেনেন?

—আলবৎ চিনি। হরপ্রসাদ সরখেল বছর পাঁচেক আগে মারা যান। তারপর তাঁর ছেলে ঐ প্রমোদ সরখেল নীচুস্তরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে একেবারে গোল্লায় গিয়েছিল। মাঝে একবার খুনের দায়ে জেলও খেটেছে। শুনেছিলাম সে নাকি জেলের গারদ কেটে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

—বাঃ চমৎকার সার্টিফিকেট। তাহলে তো নীনা সরখেলকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন।

—বলা মুশকিল। কেননা আমি কারও সঙ্গে বড় একটা মেশামেশি করতাম না। অবশ্য মেয়েটিকে যদি আমি দেখে থাকি তবে নিশ্চয়ই চিনতে পারবো।

—না রমাশঙ্করবাবু, মেয়েটিকে চিনলেও আপনাকে না চেনার ভান করতে হবে। প্রমোদ সরখেলকেও আপনি চিনতে চাইবেন না। কারণ নীনা সরখেল আমায় কতদূর সত্যিকথা বলছে আমি জানতে চাই।

সুরেশ বললে,—আমার মনে হয় স্যার, এর মধ্যে কোন মতলব আছে।

—কি রকম?

—সংগ্রাম সিং বোধহয় নীনা সরখেলকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে আমরা কতদূর কি করছি জানতে চায়। কিংবা হয়তো জানতে চায় আমরা কেন রমাশঙ্করবাবুকে সাহায্য করছি। আমাদের স্বার্থ কি। মোট কথা নীনা সরখেলের ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।

প্রফেসর সেন কোন কথাই বললেন না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে নীনা সরখেল ট্যাক্সি নিয়ে এল। ট্যাক্সি থেকে নামার আগে সে বাড়ির নম্বরটা দেখে নিল। তারপর ভাড়া চুকিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্রুত দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভ্রমর সিং দরজা খুলে দিল।

নীনা ভ্রমর সিংয়ের বিরাট যমদূতের মত চেহারার দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করল,—এটা কি প্রফেসর ত্রিদিব সেনের বাড়ি?

—হ্যাঁ। আপনার নাম নীনা সরখেল।

—হ্যাঁ।

—ভিতর আইয়ে।

নীনা প্রবেশ করতে ভ্রমর সিং দরজা বন্ধ করে দিল।

নীনার বয়স পঁচিশ ছাবিবশ। ছিমছাম চেহারা। দেহের কোথাও বাড়তি মেদ নেই। এককথায় বলা চলে নীনা সুন্দরী।

প্রফেসর সেন, সুরেশ আর রমাশঙ্করবাবু যে ঘরে বসেছিলেন ভ্রমর সিং নীনাকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল।

—এটা কি প্রফেসর ত্রিদিব সেনের বাড়ি?

ঘরে পা দিয়ে নীনার নজর প্রথমেই রমাশঙ্করবাবুর ওপর গিয়ে পড়ল। রমাশঙ্করবাবুকে প্রফেসর সেনের বাড়িতে দেখবে নীনা একেবারে কল্পনা করেনি। তাই ওর মুখখানা রমাশঙ্করবাবুকে দেখামাত্র মৃতের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

প্রফেসর সেন সেটা লক্ষ্য করে মনে মনে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হল মিস্ সরখেল, আপনি রমাশঙ্করবাবুকে চেনেন নাকি?

নীনা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

বললে,—হ্যাঁ চিনি, উনি আমার বাবার বিশেষ বন্ধু—

রমাশঙ্করবাবু অবাক্ হবার ভান করে বললেন,—আমি তোমার বাবার বন্ধু। তোমার বাবার নাম কি?

—স্বর্গীয় হরপ্রসাদ সরখেল।

—আচ্ছা তুমি হরপ্রসাদের মেয়ে। তোমার নামটা—

—নীনা ?

—দাঁড়াও দাঁড়াও। নীনা—নীনা সরখেল। তুমি সেদিন রাত্রে আমাকে টেলিফোন করেছিলে না ?

নীনা কেঁপে উঠল। ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিয়ে আহত কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল,—হ্যাঁ। ওরা আমাকে টেলিফোন করতে বাধ্য করেছিল। দাদার মুখের দিকে চেয়ে আমাদের পরিবারে মুখের দিকে চেয়ে আমি সেদিন রাত্রে টেলিফোন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কাকাবাবু—

নীনার দু চোখ ছাপিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল। ওষ্ঠাধর কাঁপতে লাগল। নীনা ছুটে এসে রমাশঙ্করবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বললে,—কাকাবাবু আপনি আমাকে বাঁচান।

রমাশঙ্করবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন,—আরে আরে আমি বাঁচাবার কে। আমার কোন শক্তিসামর্থ্য নেই মা, যা বলার তুমি প্রফেসর সেনকে বল। বাঁচাবার হলে উনিই বাঁচাবেন। দেখলে না আমাকে কিভাবে দু-দুবার সাংঘাতিক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচালেন।

প্রফেসর সেন পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে করতে নীনাকে বললেন,—মিস্ সরখেল কান্নাকাটি করবেন না। রমাশঙ্করবাবু ঠিকই বলেছেন আপনাকে রক্ষা করার শক্তি ওঁর নেই।

নীনা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বললে,—আমি নিজের জন্যে এতটুকু ভাবি না। যদি সিংজীর কথায় ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালা আমাকে পাগলা কুকুরের সীরাম ইনজেকশন দেয় তাতেও আমি ভয় করি না। আমার ভয় শুধু আমার পঙ্গু ভাইটাকে নিয়ে। ওরা আমার পঙ্গু ভাইকে আটকে রেখেছে। ওদের কথামত আমরা কাজ না করলে পঙ্গু ভাইটাকে চোখের সামনে তিলে তিলে হত্যা করবে। সেটা আমি কিছুতে সহ্য করতে পারবো না। নীনা অশ্রুমতী হয়।

প্রফেসর সেন বললেন,—কিন্তু চোখের জল ফেলে কোন লাভ হবে না মিস্ সরখেল। তার চেয়ে আমাকে সব কথা খুলে বলুন। তারপর আমি বিবেচনা করে দেখবো আপনাকে বা আপনার পঙ্গু ভাইকে রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা।

নীনা নিজেকে সামলে নিল। সে ভাল করেই বুঝেছিল যে চোখের জলে আর কেউ ভুলুক প্রফেসর সেন ভুলবেন না। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলে।

প্রফেসর সেন জেরা করতে শুরু করলেন,

—আপনি আমার নাম-ঠিকানা কোথায় পেলেন ?

—মণিশঙ্করের কাছ থেকে।

সবাই চমকে উঠল। মণিশঙ্করের নাম নীনা সরখেলের মুখে শোনা যাবে একথা

কেউ আশা করেনি। এ যেন বিনা-মেঘে বজ্রপাতের মত। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলতে পারল না। প্রফেসর সেন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন,

—মণিশঙ্কর তোমাকে কোথায় বলেছে ?

—বাঙ্গালোরে।

—মণিশঙ্করের সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয় ?

—অনেকদিনের। কাকাবাবু যখন হায়দ্রাবাদে ছিলেন তখন মণিশঙ্কর প্রায়ই যাতায়াত করতো। সেই সময় থেকে ওর সঙ্গে আমার মেলামেশা শুরু হয়। একথা কেউ জানতো না। জানতো আমার দাদা। বাবার মৃত্যুর পর থেকে দাদা অসৎ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। সেই সময় থেকেই দাদার সঙ্গে সিংজীর পরিচয় হয়। কাকাবাবু যখন দেবগিরিতে গেলেন আর যখন রত্ন সিংহাসনের হদিস সিংজী পেল তখন থেকেই শুরু হয় ষড়যন্ত্র। সিংজী দাদাকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে যায় দেবগিরিতে। দাদা কাকাবাবুকে ভাল করেই চিনতো। সেই জন্যে কাকাবাবুকে বশে রাখার জন্যে দাদার সাহায্য সিংজীর খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। দাদা খুনের দায়ে জেলে গিয়েছিল। ঐ সিংজী দাদাকে জেল থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল। সেই থেকে দাদা সিংজীর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। সিংজী যা বলতো দাদা অন্ধের মতো তাই বিশ্বাস করতো।

কাকাবাবু সিংজীকে যখন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। আর সিংজী যখন বুঝতে পারল যে কাকাবাবু রত্ন সিংহাসনের সন্ধান পেয়েছেন তখন সে কাকাবাবুকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল। ঠিক এর পর থেকেই আমার জীবনে নেমে এলো অন্ধকার।

দাদা অবুঝ। দাদা জানতো আমার সঙ্গে মণিশঙ্করের আলাপ আছে। সেকথা সে সিংজীকে বলেছিল। সিংজী দেখল কাকাবাবুকে আটকে রেখে ভয় দেখিয়ে রত্ন সিংহাসনের খোঁজ পেতে গেলে মণিশঙ্করকে ঠেকাতে হবে। কারণ কাকাবাবুর খোঁজ না পেলে একমাত্র মণিশঙ্কর থানা-পুলিস করতে পারে। সেইজন্য একেবারে নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্যে সিংজী দাদাকে চাপ দিতে লাগল।

দাদাকে আমি খুব ভালবাসি। দাদার কোন ক্ষতি হোক তা আমি চাইতাম না। সেই দাদা এসে যখন বললে যে মণিশঙ্কর যাতে কাকাবাবুর খোঁজখবরের জন্যে থানা-পুলিস না করে তার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে তখন আমি কিছুতেই রাজী হইনি। আমি অমত জেনে সিংজী রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। আমার অনুপস্থিতিতে সে আমার পঙ্গু ভাইটাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল তার আস্তানায়, তারপর আমার সঙ্গে দেখা করে বললে, যদি আমি তার কথামত কাজ করতে রাজী না হই তাহলে সে আমার দাদাকে ফাঁসি

কাষ্ঠে ঝোলাবে. আর পঙ্গু ছোট ভাইটাকে আমার চোখের সামনে তিলে তিলে হত্যা করবে।

সিংজী যে কত সাংঘাতিক লোক সেটা দাদার মুখে আগেই শুনেছিলাম। তাই আর আপত্তি করতে সাহস হয়নি। শুধু দাদা আর ছোটভায়ের মুখ চেয়ে আমি বাঙ্গালোরে মণিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

মণিশঙ্কর আমাকে এতটুকু অবিশ্বাস করেনি। সে তো জানতো না যে দাদা সিংজীর অনুচর। তাই আমার কাছে অকপটে সব কথা খুলে বলেছে। বলেছিল কাকামণিকে সিংজীর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে সুরেশবাবুকে চিঠি লিখেছে। সুরেশবাবুকে সে অনুরোধ করেছে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্যে। মণিশঙ্কর যে কদিন বাঙ্গালোরে ছিল সে কদিন রোজই তার সঙ্গে আমি দেখা করতে যেতাম। সিংজী আমাকে বলেছিল মণিশঙ্করের কাছে কাকাবাবুর ডায়েরী আর একটা ম্যাপ আছে। সেই দুটো জিনিস যেমন করে হোক চুরি করে সিংজীকে দিতে হবে।

অগত্যা আপনারা যেদিন এলেন আর মণিশঙ্কর আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে রুম ছেড়ে চলে গেল সেদিন সুযোগ পেয়ে ডায়েরী আর ম্যাপটা চুরি করে দাদাকে দিয়েছিলাম। পাছে মণিশঙ্কর আমাকে সন্দেহ করে, সেইজন্য দাদা মণিশঙ্করের সুটকেশটা ধারাল ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে কেটে দিয়েছিল।

ভেবেছিলাম তারপর সিংজী আমাকে রেহাই দেবে। হয়তো বা আমি রেহাই পেতামও। কিন্তু আপনারা অবিশ্বাস্য কাণ্ড করলেন। রাতারাতি সিংজীর ড্রাইভারকে খুন করে সিংজীর গাড়িতেই ফাঁদ পেতে রাখলেন। সিংজী আর ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালা ধরা পড়ল। আপনারা কাকাবাবুকে মুক্ত করে নিয়ে পালালেন।

এই ঘটনায় সিংজী ক্ষেপে গেল। চরম প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে তখন মরিয়া। আপনাদের তিনজনকে সিংজী চিনতে পারেনি কিন্তু মণিশঙ্করকে ঠিক চিনেছিল। তাই তার যত রাগ এসে পড়ল আমাদের দুই ভাই বোনের ওপর। ওর ধারণা হল আমিই মণিশঙ্কর এবং আপনাদের কাকাবাবুর সন্ধান দিয়েছি।

আর সেই ধারণা করে সে আমাদের হুকুম করল আমরা যদি কলকাতায় গিয়ে কাকাবাবু আর মণিশঙ্করকে খুন করতে সাহায্য না করি তবে সে আমাদের ওপরে চরম প্রতিশোধ নেবে।

অগত্যা আমাদের আসতেই হল। মণিশঙ্করের বালিগঞ্জের ঠিকানা আমার জানা ছিল। সেখানে গিয়ে মণিশঙ্করের চাকরের কাছ থেকে বেলেঘাটার ঠিকানা জেনে নিয়ে রাত্রেই টেলিফোন করেছিলাম।

আমি যখন টেলিফোন করি তখন সিংজী আর ডাক্তার খাণ্ডেল-ওয়ালা আমার পিঠে রিভলবার উঁচিয়ে ছিল। তারা যা বলেছে আমি ঠিক সেই কথাগুলো কাকাবাবুকে বলেছি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাকাবাবুর কোন ক্ষতি করতে সে পারল না। দলের চারজন লোক জখম হল। আপনার গুলি খেয়ে অ্যামব্যাসাডর গাড়ির ড্রাইভার মরল। সিংজী আর ডাক্তার অল্পের জন্যে বেঁচে গেল।

এত সত্ত্বেও ওরা হাল ছাড়ল না। দাদার ওপর হুকুম হল আপনাকে আর কাকাবাবুকে যেমন করে হোক খুন করতেই হবে।

কে দাদাকে খবর দিয়েছিল আপনি আর কাকাবাবু আজ ঐ সময় লালবাজারে যাবেন জানি না। দাদা শুধু যাবার সময় বললে, দেখ, আজ যদি আমার কিছু হয় বা আমি ধরা পড়ে যাই তাহলে তুই আর দেরি করিস না, সোজা প্রফেসর সেনের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবি। সিংজীর অন্যায় জবরদস্তি আর সহ্য করিস না। আমার বিশ্বাস প্রফেসর সেন তোকে আর পঙ্গু বাবলুকে রক্ষা করতে পারবেন।

—আস্তানাটা আপনি চেনেন? [পৃষ্ঠা ৯১০

এই কথা বলে দাদা চলে গেল। আমার ঠিকানায় সিংজী আর ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালা রোজই আসে। দাদা কাছে থাকত বলে কোনদিন ওরা আমার সঙ্গে অসভ্যতা করেনি। কিন্তু যে মুহূর্তে সিংজী আমায় টেলিফোন করে জানাল যে দাদা আপনার গাড়িতে হাত বোমা ছুড়তে গিয়ে নিজেই মারা পড়েছে, তখুনি আমি জানতাম ওরা ফিরে এসে সর্বপ্রথম আমার ওপর দৈহিক অত্যাচার করবে।

ওদের দুজনকেই আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া দাদার কথা ভেবে আমারও কম অনুশোচনা হয়নি। এমনি করে ঐ শয়তান দুটোর মুখ চেয়ে বসে না থেকে বাঁচার জন্যে

বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পোস্ট অফিস থেকে আপনাকে টেলিফোন করে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এসেছি আপনার কাছে।

একটানা কথা বলে নীনা থামল। যতক্ষণ সে কথা বলছিল ততক্ষণ প্রফেসর সেন তার মুখের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরিয়ে নেননি। নীনা থামতে তিনি প্রশ্ন করলেন,—আপনার ছোট পঙ্গু ভাইকে সিংজী কোথায় আটকে রেখেছে?

—দেবগিরিতে, ওদের গুপ্ত আস্তানায়।

—আস্তানাটা আপনি চেনেন?

—আস্তানায় আমি কখনও যাইনি। তবে দাদা আমাকে বলেছে আস্তানাটা কোথায়? দরকার হলে সেখানে আপনাদের আমি নিয়ে যেতে পারব।

—সেটা পরে ভেবে দেখব। আপাততঃ আরও কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর চাই। সিংজী আর ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালা কলকাতায় এসে কোথায় উঠেছে?

—জানি না। তবে দাদা বলেছিল ওরা খিদিরপুরে থাকে। রাস্তার নাম ঠিকানা বলেনি।

—সেদিন রাত্রে আপনি কোথা থেকে রমাশঙ্করবাবুকে টেলিফোন করেছিলেন?

—আর্মেনীয়ান স্ট্রীট থেকে। অবশ্য আমি টেলিফোন করার অনেক আগে সিংজীর লোকজনেরা বেলেঘাটার বাড়িতে চড়াও হওয়ার জন্যে রওনা হয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল রাত বারোটায় আমি টেলিফোন করবো আর ঠিক বারোটা দশ মিনিটে ওরা আক্রমণ শুরু করবে। সিংজী বলে দিয়েছিল, এক সঙ্গে তিনজনকেই ওরা যেন গুলি করে মেরে ডায়েরী আর ম্যাপটা নিয়ে আসে।

প্রফেসর সেন বললেন,—আচ্ছা, রমাশঙ্করবাবুর ডায়েরী আর ম্যাপটা যদি আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আপনি নিশ্চয়ই সিংজীর কাছে ফিরে যেতে আপত্তি করবেন না।

নীনা সরখেল দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বললে,—আমি কিছুতেই ফিরে যাব না। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করতে রাজী না হন তবে এখান থেকে ফিরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হব। আমি জানি আমার পঙ্গু ভাইটাকে এর পরে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করে মরতে হবে। তা হোক, ওকে যখন রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তখন ওর কপালে যা আছে হবে। আমি আর কিছুতে সিংজীর জন্যে অন্যায় পাপ করতে পারবো না।

নীনার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। চোখের জল কিছুতে সামলাতে পারল না।

* * * *

(ক্রমশঃ)

দেবগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

১১

খিদিরপুর অঞ্চলের নির্জন পরিবেশ, হালফ্যাশানের একটি দোতলা বাড়ির আধুনিক আসবাবপত্রে সুসজ্জিত একটি কক্ষে সংগ্রাম সিং দেবরায় হাতে একটা চিঠি নিয়ে গুম হয়ে বসেছিল। দেখেই বোঝা যায় নানান দুশ্চিন্তায় তার মন ভারাক্রান্ত। মাঝে মাঝে নিষ্ফল আক্রোশে তার চোয়াল দুটো ফুলে ফুলে উঠছে।

এক সময় ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করল ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালা। ঘরের মধ্যে পা দিয়ে সংগ্রাম সিংকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। সংগ্রাম সিংকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে করতে ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালার ওষ্ঠপ্রান্তে বিষাক্ত এক টুকরো হাসি খেলে গেল।

ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালা এগিয়ে এল। সংগ্রাম সিংয়ের নজর পড়তে সে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল—কোন খবর পেলে?

ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালা হতাশার সুরে বললে,—না। কলকাতার হেন জায়গা নেই যে খোঁজ করিনি। কোথাও নীনার খোঁজ পেলাম না। প্রফেসর সেনের বাড়িতে আমি নিজে গিয়েছিলাম খোঁজ করতে। সেখানে ও নেই।

—প্রফেসর সেনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

—না। আমি ছদ্মবেশে গিয়েছিলাম ইলেকট্রিক মিটার দেখতে। সে বাড়িতে নীনা কোন মতে যেতে পারে না।

সংগ্রাম সিং হাতের চিঠিটা ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে,—পড়ে দেখ।

ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালা মেঝে থেকে চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ল।

—এ কি! বাবলু মারা গেছে।

—হ্যাঁ খাণ্ডেলওয়ালা। মারা গেছে। হঠাৎ নয়, ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। অথচ কে বিষ খাওয়াল, কার হুকুমে বিষ খাওয়াল বোঝা যাচ্ছে না। এ সবের মানে কি?

—মানে। তা আমি কি করে বলবো।

—খাণ্ডেলওয়ালা, আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করো না। আজ দশদিন হল নীনা সরখেল আমাদের হেপাজত থেকে উধাও হয়েছে, আজ পর্যন্ত আমরা তার কোন রকম হদিস করতে পারছি না। কেন পারছি না, কেন নীনার মত একটা বোকা মেয়ে হঠাৎ চালাক হয়ে গেল সেটা আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝেছি।

ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললে,—তুমি কি বলতে চাও সংগ্রাম সিং?

—আমি কি বলতে চাইছি তা কি তুমি বুঝতে পারছো না। বাবলুকে বিষ দিয়ে হত্যা করার হুকুম কে দিয়েছে?

—অন্ততঃ আমি দিইনি।

—আলবাৎ তুমি—

সংগ্রাম সিং হঠাৎ বোমার মত ফেটে পড়ল। ধাঁ করে ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে রিভালবার বের করে ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালার দিকে তাগ করে দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বলতে লাগল,—আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করো না খাণ্ডেলওয়ালা। তোমার শয়তানী আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

—তুমি কি বলছো সংগ্রাম সিং?

—ঠিকই বলছি। নীনাকে দেখা অবধি তুমি মুগ্ধ হয়ে গেছ। ওকে পাবার জন্যে তুমি নানান ফন্দি আঁটছিলে। বাংলা দেশে এসে নীনার বড় ভাইকে তাই তুমি সাত তাড়াতাড়ি বোমা ছুড়তে পাঠালে। তুমি বেশ ভাল করেই জান লালবাজার থানার সামনে বোমা ছুড়তে যাওয়ার অর্থ মৃত্যু। হয় সে ধরা পড়বে নয়তো পালাতে গিয়ে পুলিসের গুলি খেয়ে মরবে। এইভাবে তুমি প্রথম কাঁটা সড়ালে। তারপর এখান থেকে দেবগিরিতে তোমার চেলা-চামুণ্ডাদের চিঠি দিয়ে বাবলুকে বিষ খাইয়ে মারলে। দ্বিতীয় কাঁটা সরিয়ে ফেলার আগেই বুদ্ধি করে নীনাকেও সরিয়ে ফেললে।

ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল,

—না না বন্ধু, না। এ সব তোমাকে যে বলেছে সে তোমার আমার এতদিনের বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাইছে।

—বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাইছে, তাই না?

সংগ্রাম সিং তার একটা চিঠি টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে বললে,—দেবগিরি থেকে ইন্সপেক্টর হোসেন কি লিখছেন শোন।

সংগ্রাম সিং চিঠি পড়তে শুরু করল।

প্রিয় মিঃ সিং,

তোমাকে একটি গুপ্ত কথা জানাচ্ছি। আমার মনে হয় ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালাকে বিশ্বাস করে আমরা ভুল করেছি। লোকটা পয়লা নম্বরের শয়তান। তোমার দলের মধ্যে থেকেই সে তোমাকে ধ্বংস করতে চাইছে রত্ন সিংহাসনের লোভে। আমি প্রমাণ ছাড়া কোন মতবাদ প্রকাশ করি না তা তুমি ভাল করেই জান। ঐ খাণ্ডেলওয়ালা এখানে তার দলের লোকের কাছে গোপনে চিঠি দিয়েছিল পঙ্গু বাবলুকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার জন্যে। সেই মত ওর চেলাচামুণ্ডারা বাবলুকে খুন করেছে। ফলে, এখানে তোমার দলের মধ্যেই গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। বাবলুর মৃতদেহ কবর দেওয়া হল অসাবধানে। তার পরিণতি মোটেই ভাল হল না। ভারতীয় ফৌজের হাতে মৃতদেহ গিয়ে পৌঁছেছে। এ নিয়ে দারুণ হৈ চৈ আরম্ভ হয়েছে। আমার মনে হয় এই সময় তোমার পক্ষে দেবগিরি মোটেই নিরাপদ নয়। এখানে ভুলেও এসো না। পার তো ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালাকে সরিয়ে ফেল।

এই পর্যন্ত পড়ে সংগ্রাম সিং থামল। ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালা চিৎকার করে উঠল, —ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র—তুমি বিশ্বাস করো না সংগ্রাম সিং। ইন্সপেক্টর হোসেন সুযোগ বুঝে আমাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে চাইছে। ও শয়তান নিজাম বাহাদুরের চর—

ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালাকে কথা শেষ করতে দিল না সংগ্রাম সিং। তার হাতের সাইলেন্সার লাগান রিভালবার থেকে এক ঝলক আগুন ছুটে বেরিয়ে গেল খাণ্ডেলওয়ালার দিকে।

ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালা ককিয়ে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সংগ্রাম সিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার দেহটা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত বিকারগ্রস্ত রুগীর মত কাঁপতে কাঁপতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

সংগ্রাম সিং কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে হাঁক পাড়ল—জব্বর সিং—

ডাক দেওয়ামাত্র জব্বর সিং এল। সংগ্রাম সিং হুকুম করল—লাশ সরিয়ে ফেল।

* * * *

সুরেশ হায়দ্রাবাদ গিয়েছিল প্রফেসর সেনের আদেশে।

তার আগে প্রফেসর সেন পুলিস কমিশনারের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে সুরেশকে একটা পরিচয়-পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেই পরিচয়-পত্র নিয়ে সুরেশ গোপনে প্রথম ফ্লাইটে হায়দ্রাবাদ রওনা হয়।

ওকে কেউ চেনে না। সেটা সুবিধেই হয়েছিল। ভারতীয় ফৌজ তখন হায়দ্রাবাদ পুরোপুরি অধিকার করে নিয়ে দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে। প্রত্যেক থানায় থানায় তখন কড়া শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

সেই সময় সুরেশ কম্যাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয়-পত্র দেখাল। তাতে কাজও হল। কম্যাণ্ডিং অফিসার স্পেশাল মিলিটারী পুলিস সঙ্গে দিয়ে সুরেশকে পাঠিয়ে দিলেন দেবগিরি।

রিভলবার থেকে এক ঝলক আগুন ছুটে বেরিয়ে গেল··· [পৃষ্ঠা ৪৬

দেবগিরিতে পৌঁছে সুরেশ সর্বপ্রথমে ইন্সপেক্টর হোসেনকে গ্রেফতার করল। দ্বিতীয়তঃ, নীরা সরখেলের কথামত সংগ্রাম সিংয়ের গোপন আস্তানা খুঁজে বের করে পঙ্গু বাবলুকে উদ্ধার করে। সেই সময় যারা ছিল তাদেরও গ্রেফতার করে নিয়ে এল থানায়।

প্রফেসর সেনের কথামত সে ইন্সপেক্টর হোসেনকে বাধ্য করল তার লেটার প্যাডের একটা সাদা কাগজে সই করে দিতে। ইন্সপেক্টর হোসেন সই করে দিলেন। সুরেশ তখন সেই সাদা কাগজে ইংরিজিতে চিঠি লিখল সংগ্রাম সিংকে। সেই চিঠি পড়ে সংগ্রাম সিং ক্ষেপে গিয়ে ডাঃ খাণ্ডেলওয়ালাকে খুন করে বসল। প্রফেসর সেনের চালাকিটা সে ধরতে পারল না। বাবলুকে কেউ বিষ প্রয়োগে হত্যা করেনি। ওটাও একটা মিথ্যা চাল। প্রফেসর সেনের চালাকি।

সেই চালাকিতে বাজীমাৎ হয়ে গেল। সুরেশ ফিরে এল কলকাতা। গোপনে প্রফেসর সেনকেই শুধু জানাল দেবগিরির সমস্ত কথা।

এদিকে প্রফেসর সেন চুপ করে বসেছিলেন না।

সংগ্রাম সিংয়ের ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সংগ্রাম সিং অতি ধুরন্ধর লোক। তার অপরাধের কোন প্রমাণই সে রাখেনি। কলকাতায় তার অনেক আস্তানা। কখন কোথায় সে থাকে কেউ জানত না। তাছাড়া ছদ্মবেশ ধারণ করতেও সে ছিল সিদ্ধহস্ত। কখন কোন্ ছদ্মবেশে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোঝা দুষ্কর।

এই সব কারণেই প্রফেসর সেন অতি সাবধানে এগোচ্ছিলেন। সুরেশ ফিরে এসে যেই জানাল যে তাঁর আদেশমত সে নিখুঁতভাবে কাজ করে ফিরে এসেছে তখন তিনি আর এক মুহূর্ত দেরি করতে চাইলেন না। রমাশঙ্করবাবুকে বললেন,—আর দেরি না ক'রে আমাদের রওনা হতে হবে।

—কোথায় যাবেন, দেবগিরি?

—না সোজাসুজি বিন্ধ্যপর্বতে?

—সেকি প্রফেসর। এখনও যে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত নই। ম্যাপটা নিয়ে আমাদের আরও কিছুদিন বসা দরকার। তাছাড়া সাংকেতিক ভাষাটা সম্বন্ধে এখনও আমার সন্দেহ আছে।

প্রফেসর সেন নির্বিকার কণ্ঠে বললেন,—আমার মনে কোন সন্দেহ নেই রমাশঙ্কর-বাবু। 'স্পটে' গিয়ে পৌঁছুতে পারলে আপনার মনেও কোন সন্দেহ থাকবে না।

তবু রমাশঙ্করবাবু আপত্তি করেন।

—না মশাই, আন্দাজে অতদূর বিপদের মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। শেষে কি বেঘোরে প্রাণটা দেব। তাছাড়া কলকাতায় মণিশঙ্করকে ফেলে যাওয়া কি ঠিক হবে। সংগ্রাম সিং আমাদের হদিস না পেয়ে যদি মণির কোন ক্ষতি করে বসে তাহলে অনুতাপের সীমা থাকবে না।

প্রফেসর সেন মনে মনে হাসলেন। কিন্তু মুখে কোন প্রতিবাদ না করে বললেন,—মণি এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছে। আমার মনে হয় সেও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে।

—আপনি কি বলছেন প্রফেসর? মণির বুকে গুলি লেগে ছিল—

—বুকে নয়, ডান বাহুতে।

—ডান বাহুতে—?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বুকে লাগলে সে এতক্ষণ কখনই বেঁচে থাকতে পারত না।

—কিন্তু প্রথম দিন আপনিই আমাকে বলেছিলেন যে মণির বুকে বুলেট লেগেছে। এ যাত্রায় সে রক্ষা পেলেও ছমাসের আগে মাটিতে পা দিতে পারবে না।

প্রফেসর সেন হেসে বললেন,—সেদিন আমি সত্যকে বিকৃত করতে বাধ্য হয়েছিলাম, রমাশঙ্করবাবু। তা না বললে আপনি মণিকে হাসপাতালে দেখতে যেতে চাইতেন, সেটা আপনার পক্ষে মারাত্মক হতো। সংগ্রাম সিং কোথায় কখন ওৎ পেতে থাকেন। আপনিই তো বলেছেন, ছদ্মবেশ ধারণ করতে সংগ্রাম সিং সিদ্ধহস্ত।

রমাশঙ্করবাবু এতক্ষণে নতি স্বীকার করলেন। বললেন,—মণি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে পারে তবে আমিও রাজী। আপনি কবে রওনা হতে চান?

—আপনি কি বলছেন প্রফেসর? [পৃষ্ঠা ৩২

—আজ রাত্রে—

—সে কি, আজ রাত্রে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখান থেকে চার্টার্ড প্লেনে আমরা প্রথমে যাব মাইশোর। সেখান থেকে হেলিকপ্‌টারে যাব বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলে।

—হেলিকপ্‌টার কোথায় পাবেন? কে দেবে আপনাকে? একমাত্র মিলিটারী হেলপ্ ছাড়া পাওয়া যেতে পারে না।

—আপনি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানেন রমাশঙ্করবাবু। মাইশোরের রাজা আমার বিশিষ্ট বন্ধু। আমি অনুরোধ করলে তাঁর প্রাইভেট হেলিকপ্‌টারটা না দিয়ে পারবেন না।

রমাশঙ্করবাবুর চোখদুটো জ্যোতিষ্কের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন,—এতটা আমার জানা ছিল না প্রফেসর সেন। ক্ষমা করবেন। তাহলে, আমরা কে কে যাচ্ছি?
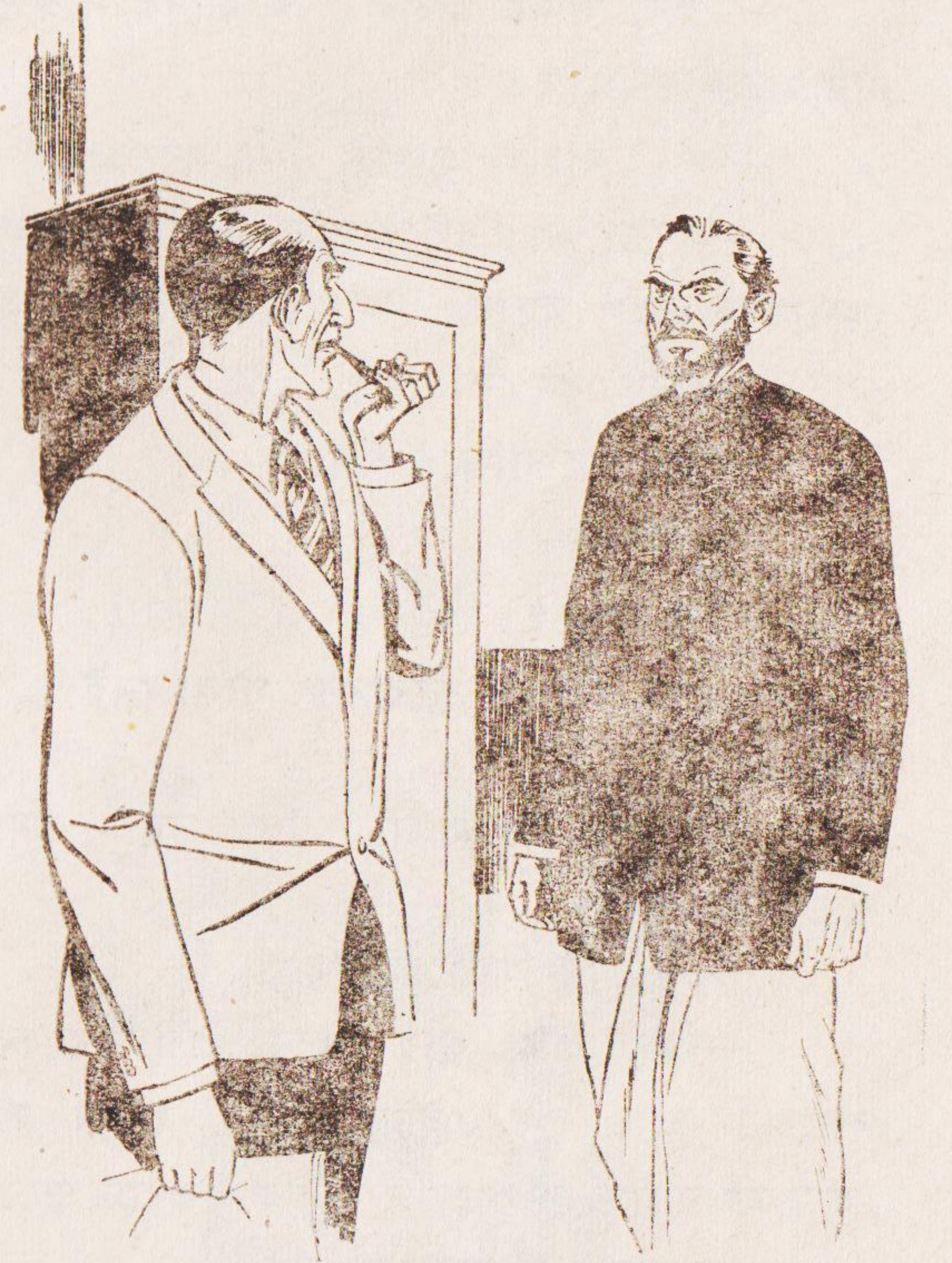
—কেন, আমরা সবাই। আমাদের সঙ্গে সুরেশ যাবে, ভ্রমর সিং যাবে, মণিশঙ্কর আর নীনা সরখেলও যাবে।

—ও। তাহলে আপনি নীনা সরখেলকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছেন?

—আজ্ঞে না। পুরোপুরি বিশ্বাস করলে ওকে সঙ্গে নিতাম না। এখানে পুলিসের হেপাজতে রেখে যেতাম। আমাদের কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে ওর কথা ভাবতাম।

—নীনা এখন কোথায়?

—সুরেশের বাড়িতে আছে?

—বুঝলাম—

—কি বলুন?

—সেই জন্যেই সুরেশের পাত্তা নেই। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হল তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—সুরেশ কলকাতায় ছিল না রমাশঙ্করবাবু। ওকে আমি দেবগিরিতে পাঠিয়েছিলাম।

—কেন, দেবগিরিতে কেন?

—প্লিজ আজ আর কোন প্রশ্ন করবেন না রমাশঙ্করবাবু। পরে আপনাকে সব বলবো। আজ শুধু এইটুকু জেনে রাখুন সংগ্রাম সিং যাতে পিছন থেকে আমাদের আক্রমণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে সুরেশকে দেবগিরিতে পাঠিয়েছিলাম।

রমাশঙ্করবাবু বললেন,—

—দেখুন প্রফেসর, আপনার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমি জানি, বিশ্বাস করি আপনি যা করবেন সবটাই আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্যে। তবু আমার ওপরে দু দুবার মারাত্মক আক্রমণ হয়ে গেছে। সেইজন্যই সব কিছু জানতে চাইছি।

এও আমি বুঝি যে, পাছে আমি আরও নার্ভাস হয়ে পড়ি এই ভয়ে আপনি আমাকে ইদানীং সব কথা জানাচ্ছেন না। তাই আমার একান্ত অনুরোধ রইল, যেটা আমি সহজে অনুমান করতে পারি সেটা আমার কাছে গোপন করবেন না। তাতে আমার আত্মমর্যাদায় ঘা পড়ে।

রমাশঙ্করবাবুর যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে প্রফেসর সেন বললেন,—

—তা যদি বলেন তাহলে আপনাকে কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে আপনাকে কোন কথাই গোপন করবো না।

এ কথায় রমাশঙ্করবাবু সেদিন যারপরনাই খুশী হয়েছিলেন। (ক্রমশঃ)

* * *

দেবগিরির দানব

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

১২

রমাশঙ্করবাবুকে নিয়ে প্রফেসর সেন দমদম এয়ারফিল্ডে যখন পৌঁছুলেন তখন রাত প্রায় দশটা।

রানওয়েতে মাঝারি আকারের একটা উড়োজাহাজ অপেক্ষা করছিল।

ফর্মাল কাজ সেরে নিয়ে প্রফেসর সেন আর রমাশঙ্করবাবু রানওয়ের দিকে এগোলেন।

রমাশঙ্করবাবুর কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল। বারবার তিনি চারপাশে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন।

একসময় তিনি প্রফেসর সেনকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি ঠিক জানেন সংগ্রাম সিং আমাদের অনুসরণ করেনি ?

—এসব ক্ষেত্রে সঠিক বলা যায় না রমাশঙ্করবাবু। তবে আমার বিশ্বাস সংগ্রাম সিংয়ের বিষদাঁত আমি ভাঙতে পেরেছি। তাড়াতাড়ি পা চালান। আমাদের প্লেন রেডি। বেশী দেরি করা উচিত নয়।

—বাকি সব কোথায় ?

—ওরা আগেই এসে গেছে।

দুজনে এসে উড়োজাহাজের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ভেতরে অন্যেরা সবাই অপেক্ষা করছিল। রমাশঙ্করবাবু দেখলেন, মণিশঙ্কর আর নীনা সবথেকে সামনের দিকের একটা আসনে পাশাপাশি বসে নিম্নকণ্ঠে কথা বলছে।

এতটা রমাশঙ্করবাবু আশা করেননি। তাই মনে মনে বোধহয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মণিশঙ্কর টের পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এসে দাঁড়াল রমাশঙ্করবাবুর সামনে। তার ডান বাহুতে তখনও ব্যাণ্ডেজ জড়ান ছিল। ক'দিনেই সে বেশ কাহিল হয়ে গেছে।

মণিশঙ্কর হেঁট হয়ে প্রণাম করতে যেতেই রমাশঙ্করবাবু ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—তোকে যে আবার ফিরে পাব সে আশাই করিনি। হাসপাতালে গিয়েও যে দেখা করবো তারও উপায় ছিল না।

মণিশঙ্কর সান্ত্বনা দিয়ে বললে,—হাসপাতালে না গিয়ে ভালই করেছেন কাকামণি। যেভাবে সংগ্রাম সিং আমাদের পিছনে লেগেছে তাতে আপনার কোনরকম রিস্ক নেওয়া চলে না। তাছাড়া প্রফেসর সেন রোজ দু'বেলা আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তাঁর মুখে আপনার সমস্ত খবরাখবর পেতাম।

রমাশঙ্করবাবু হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে বললেন,—নীনা সরখেলকে মোটে বিশ্বাস করো না। সেদিন রাত্রে ঐ মেয়েটা টেলিফোনে আমাদের ঠিকানা জেনে নিয়েছিল। ও হচ্ছে সংগ্রাম সিংয়ের লোক—

মণিশঙ্কর বললে,—নীনা আমাকে সব কথাই খুলে বলেছে কাকামণি। আমি তো নীনার কোন দোষ দেখছি না। তাছাড়া—

মণিশঙ্করকে কথা শেষ করতে দিলেন না প্রফেসর সেন। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন,—নো মোর টাইম। আমরা এখুনি টেক অফ করবো। হারি আপ, যে যার সীটে বসে বেল্ট আটকে নিন।

আদেশ শোনামাত্র মণিশঙ্কর কথা বন্ধ করে নিজের আসনে ফিরে গেল।

রমাশঙ্করবাবু প্রফেসর সেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন,—আপনার সংস্পর্শে এসে সবাই যেন লড়ুয়ে সেপাই বনে গেছে।

রমাশঙ্করবাবু হাসতে হাসতে পিছনের দিকে একটা আসনে গিয়ে বসে পড়লেন।

একটু পরেই যাত্রা শুরু হল। বিকট গর্জন করতে করতে উড়োজাহাজটা মাটি ছেড়ে আকাশের বুকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

*　　*　　*

মাইশোর পৌঁছুতে লাগবে প্রায় তিন ঘণ্টা। প্রফেসর সেন রমাশঙ্করবাবুর পাশে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। সুরেশ আর ভ্রমর সিং আসনে গা এলিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

কেবল মণিশঙ্কর আর নীনা নিজেদের মধ্যে নীচু স্বরে কথা বলছিল। ওদের কি কথা হচ্ছিল জানার কৌতূহল কারও ছিল না একমাত্র রমাশঙ্করবাবু ছাড়া। তিনি বোধহয়

কিছুতেই ওদের মেলামেশাটা পছন্দ করতে পারছিলেন না। নীনা খুনে মেয়ে। ক'দিন আগেও সে সংগ্রাম সিংয়ের দলে ছিল। ওকে অতটা বিশ্বাস করা উচিত নয়। ওর মনে কি আছে কে জানে!

রমাশঙ্করবাবু বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারলেন না। প্রফেসর সেনকে নিম্নস্বরে বললেন,—আমার মনে হয় মণিশঙ্কর ভুল করছে।

প্রফেসর সেন তাকালেন,—আমাকে কিছু বলছেন?

—আপনি কি এত চিন্তা করছেন মশাই?

—বিশেষ কিছুই না। ভাবছি বেগমের কথা।

মণিশঙ্কর হেঁট হয়ে প্রণাম করতে যেতেই···জড়িয়ে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,— [পৃষ্ঠা ১২৬

—কার বেগম?

—সুলতান ফিরোজ শাহের বেগম।

—কিন্তু আমি ভাবছি ঐ নীনা সরখেলের কথা। মণির উচিত হচ্ছে না ঐরকম একটা সাংঘাতিক মেয়ের সঙ্গে অত ক্লোজলি বসে গল্প করা। ওর মনে কি আছে কে জানে! ওকে দ্বিতীয়বার বিশ্বাস করা কি উচিত?

প্রফেসর সেন মৃদু হেসে বললেন,—আমার মনে হয় মণিশঙ্কর নীনাকে বোধহয় ভালবেসে ফেলেছে।

—অবনকসাস্! না না মশাই, এসব দুর্বলতাকে কোনমতে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয়নি। নীনা আমাদের কোন কাজে আসবে না। আমাদের সঙ্গে ওকে না নিলেই পারতেন।

প্রফেসর সেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন,—প্রথমে নীনাকে আমাদের সঙ্গে নেব না মনে করেছিলাম রমাশঙ্করবাবু। কিন্তু সেদিন কথার ছলে মেয়েটা এমন একটা কথা বলে ফেলল যেটা ওর মুখ থেকে শুনতে হবে কল্পনা করিনি।

—কিরকম?

—আমার মনে হয় রত্নসিংহাসন উদ্ধার করতে হলে নীনার সাহায্য আমাদের দরকার হবে।

সেকথা শুনে রমাশঙ্করবাবু শিরদাঁড়া সোজা করে বসলেন,—হোয়াট ডু য়্যু সে? নীনার সাহায্যে আমরা রত্নসিংহাসন উদ্ধার করবো।

—উত্তেজিত হবেন না রমাশঙ্করবাবু। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। আমরা যে সাংকেতিক চিহ্নগুলোর অর্থ উদ্ধার করার জন্যে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম নীনা দেখলাম অতি সহজে তার পাঠোদ্ধার করে ফেলল।

—আপনি আমার সঙ্গে কি তামাশা করছেন প্রফেসর সেন? নীনার মত সাধারণ একটা মেয়ে—

—নীনা সাধারণ মেয়ে বলেই পেরেছে রমাশঙ্করবাবু। আমি যে কাগজটায় সাংকেতিক চিহ্নগুলো এঁকে রেখেছিলাম অসাবধানতা বশতঃ সেই কাগজটা টেবিলের ওপর ফেলে গিয়েছিলাম। একসময় ঘরে ফিরে দেখি নীনা কাগজটা তুলে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। আমি প্রথম ওকে ভুল বুঝে, আমার অনুপস্থিতিতে কাগজপত্তর দেখার জন্যে বকাঝকা করতে ও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললে যে কোন মতলব তার নেই। নেহাত কৌতূহলবশতঃ সাংকেতিক চিহ্নগুলো দেখছিল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, এই চিহ্নগুলো ঠিকমত পরপর সাজালে একটা মানুষের মূর্তি হয়।

শুধু মুখে বলা নয়, নীনা সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নগুলো পরপর সাজিয়ে দেখিয়ে দিল। এই দেখুন ওর আঁকা কাগজটা আমি রেখে দিয়েছি।

প্রফেসর সেন তাঁর শার্টের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে রমাশঙ্করবাবুর হাতে দিলেন।

রমাশঙ্করবাবু কাগজটা দেখে চমকে ওঠেন।

কাগজে তাঁর আঁকা সাংকেতিক চিহ্নগুলো রয়েছে।

রমাশঙ্করবাবুর আঁকা ঃ—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

নীনা সরখেল এইভাবে সাজিয়েছে।

কাগজটা দেখে হয় চাপা আনন্দে কিংবা অন্য কোন কারণে রমাশঙ্করবাবুর হাত কাঁপতে লাগল। তিনি বারবার প্রফেসর সেনের দিকে তাকাতে লাগলেন। প্রফেসর সেন বললেন,—আমিও প্রথমে ঠিক আপনার মতই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম রমাশঙ্করবাবু। নীনা

বললে যে, সে যখন ছাত্রী ছিল তখন 'স্যামারিটন'দের ভাষা সম্বন্ধে যে কোন বই পেলেই সে পড়তো। স্যামারিটনদের ভাষা নাকি অনেকটা সাংকেতিক চিহ্নের মত।

একথা শোনার পরে নীনাকে আমি আর কোন প্রশ্ন করিনি। সেইদিন সেই মুহূর্তে স্থির করে নিয়েছিলাম যে রত্নসিংহাসন উদ্ধার করতে গেলে নীনাকেও সঙ্গে নিতে হবে।

রমাশঙ্করবাবু, আমার একান্ত অনুরোধ রইল, এ নিয়ে আপনি যেন ভুলেও নীনার সঙ্গে কোন আলোচনা করবেন না।

* * *

হঠাৎ উড়োজাহাজের মেশিনে দেখা দিল গণ্ডগোল।

পাইলট বিপদের সংকেত দিল।

প্রফেসর সেন ছুটে গেলেন ককপিটে…

—কি হয়েছে পাইলট?

—স্যার, একটা মেশিন বিগড়ে গেছে। আমাকে কোথাও ফোর্স ল্যাণ্ড করতে হবে।

—আমরা এখন কোথায়?

—বলতে পারবো না স্যার—প্রায় ঘণ্টাখানেক হল রাডার কাজ করছে না। দিক্ ভুল করে আমরা কোথায় চলে এসেছি বলতে পারবো না।

বলতে বলতে উড়োজাহাজ এক পাশে হেলে পড়ল।

পাইলট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,—স্যার, দশ মিনিটের মধ্যে মেশিনে আগুন লেগে যাবে। আপনাদের কাউকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না।

সেকথা শুনে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। হায় হায় হায় এ কি হল! এখন তাদের কে রক্ষা করবে! আর দশ মিনিট মাত্র।

এই সময় হঠাৎ প্রফেসর সেন চিৎকার করে উঠলেন,—সবাই চুপ কর। আমার কথা শোনো। আর দশ মিনিটের মধ্যে হয়তো আমরা কেউ বেঁচে থাকব না। কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকে আজ যে কোন একজনকে আমি বাঁচাতে চাই। আমরা যে কাজের জন্যে এত ঝুঁকি নিয়েছিলাম সেই মহান্ কাজ তাকে শেষ করতে হবে। অর্থাৎ ম্যাপ আর সাংকেতিক চিহ্ন অনুযায়ী তাকে রত্নসিংহাসন উদ্ধার করতে হবে। রত্নসিংহাসন আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। সুতরাং ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করা আমাদের মহান্ কর্তব্য।

আমার মনে হয় সুরেশ সবচেয়ে উপযুক্ত হবে। সুরেশ, তুমি আর দেরি করো না। লাগেজ রুমে একটিমাত্র প্যারাশুট আছে। তাড়াতাড়ি প্যারাশুট পিঠে বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়। দেরি করো না। আমাদের হাতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

সেকথা শোনামাত্র সুরেশ যেই লাগেজ রুমের দিকে এগোতে যাবে অমনি রমাশঙ্করবাবু হঠাৎ পকেট থেকে রিভলভার বের করে পথ আগলে দাঁড়ালেন।

—খবরদার এগোবে না! আজ এই মুহূর্তে বাঁচার অধিকার একমাত্র আমারই আছে।

—এ আপনি কি বলছেন রমাশঙ্করবাবু?

—আমি রমাশঙ্কর নই। আমি সংগ্রাম সিং—

হঠাৎ রমাশঙ্করবাবু হেঁচকা টানে তাঁর মুখের ওপর থেকে অতি সূক্ষ্ম প্লাস্টিকের মুখোশটা খুলে ফেললেন। সবাই চমকে ওঠে।

এ তো রমাশঙ্কর চাটুয্যে নয়, ছদ্মবেশী সংগ্রাম সিং। কি অদ্ভুত মুখোশ।...

সংগ্রাম সিং হাসতে হাসতে বললে,—প্রফেসর সেন, বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম কখনও ব্যর্থ হবার নয়। খবরদার কেউ শয়তানি করার চেষ্টা করো না!

সংগ্রাম সিং হাসতে হাসতে দ্রুত এগিয়ে গেল লাগেজ রুমের দিকে। এরা সবাই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল নীনা অঝোরে কাঁদতে থাকে।

সংগ্রাম সিং লাগেজ রুমে পা দিয়েই চমকে ওঠে।—এ কি! এরা কে?

স্বয়ং পুলিস কমিশনার লাগেজ রুমে উদ্যত রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন পুলিস ইন্সপেক্টর।

সংগ্রাম সিং বিদ্যুৎগতিতে লাগেজ রুমের বাইরে আসতেই দেখে প্রফেসর সেন উদ্যত রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

সংগ্রাম সিং থমকে দাঁড়াতে প্রফেসর সেন মৃদু হেসে বললেন,—আর কোন উপায় নেই সংগ্রাম সিং। তোমার রিভলভারে একটাও বুলেট নেই। তোমার অজ্ঞাতে আমি সবক'টা বুলেট বের করে নিয়েছিলাম।

সংগ্রাম সিং ট্রিগারে চাপ দিল। কোন ফল হল না। প্রফেসর সেন তাহলে মিথ্যা বলেননি। রিভলভার শূন্য। পিছন থেকে দুজন ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে সংগ্রাম সিংয়ের হাতে লোহার হাতকড়া পরিয়ে দিল।

প্রফেসর সেন বললেন,—সংগ্রাম সিং, তোমার খেলা এইখানেই শেষ হল। আমাদের যাত্রা সফল। আমাদের অভিনয় সফল।

* * * *

একমাত্র সুরেশ ছাড়া আর সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। উড়োজাহাজের মেশিন বিকল হয়ে যায়নি। ওটা অভিনয়ের একটা অঙ্গ মাত্র। সংগ্রাম সিংকে গ্রেপ্তার করার জন্য একটা ষড়যন্ত্র মাত্র।

সবাই স্থির হয়ে বসল প্রফেসর সেনের কথা শোনার জন্যে।

প্রফেসর সেন বলতে লাগলেন :

তোমরা সবাই অবাক্ হয়ে গেছ। এতদিন ধরে তোমরা যাকে রমাশঙ্করবাবু বলে জেনে এসেছ তিনি আসল নন, নকল। এটা কেমন করে হল? তবে শোন—

মণিশঙ্করের কাকামণি শ্রীরমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় যখন রত্নসিংহাসনের হদিস পেলেন তখন থেকেই সংগ্রাম সিং তাঁকে হত্যা করার মতলব করেছিল। তাই আগে থেকে সে ব্যবস্থা করে রেখেছিল। যেদিন ভারতীয় ফৌজ হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করে সেদিন সংগ্রাম সিং সুযোগ নিল।

প্রফেসর সেন উদ্যত রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

[পৃষ্ঠা ১৩০

রাতারাতি রমাশঙ্করবাবুকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে। খাণ্ডেলওয়ালা বহুকাল ফ্রান্সে ছিল। সেখানে এক প্লাস্টিক কারখানায় মুখোশ তৈরির কাজে সে বেশ হাত পাকিয়ে নিয়েছিল। সংগ্রাম সিং সেটা জানত। খাণ্ডেলওয়ালা আর সংগ্রাম সিং ছেলেবেলার বন্ধু। সেই সুবাদে সংগ্রাম সিংয়ের সঙ্গে খাণ্ডেলওয়ালার বরাবরই একটা যোগাযোগ ছিল।

যাই হোক, সংগ্রাম সিংয়ের জরুরী চিঠি পেয়ে খাণ্ডেলওয়ালা আগেই চলে এসেছিল। খাণ্ডেলওয়ালা ছিল লোভী। তাই রত্নসিংহাসনের কথা শুনে সে তখুনি সংগ্রাম সিংয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে রাজী হয়েছিল।

রমাশঙ্করবাবুর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় দেবগিরি শহরের বাইরে সংগ্রাম সিংয়ের আড্ডায়। সেখানে রমাশঙ্করবাবুর মুখের ছাপ তুলে নিয়ে খাণ্ডেলওয়ালা সাত দিনের মধ্যে চমৎকার একটা প্লাস্টিকের মুখোশ তৈরি করে ফেলল।

সেই মুখোশ পরে সংগ্রাম সিং রমাশঙ্করবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করে দিল।

বহুদিন থেকেই সংগ্রাম সিং রমাশঙ্করবাবুর কাছাকাছি ছিল। তাঁর হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তা সবই সে লক্ষ্য করত। সংগ্রাম সিং কলকাতার মানুষ। সুতরাং সে বাংলা ভাষা বলত ঠিক বাঙালীর মত।

সব দিক দিয়েই সংগ্রাম সিংয়ের সুবিধে হয়েছিল, একমাত্র মণিশঙ্কর ছাড়া। মণিশঙ্কর হঠাৎ দেবগিরিতে গিয়ে হাজির হতে সে একটু ঘাবড়ে গেল।

সমরু সংগ্রাম সিংয়ের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। সে সংগ্রাম সিংকে বললে মণিশঙ্করকে না সরালে বিপদ্ ঘটতে পারে।

অগত্যা আর একটা ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ান হল। কিন্তু মণিশঙ্কর হঠাৎ বাঙ্গালোর চলে যাওয়ায় তাকে রাতারাতি হত্যা করা সম্ভব হল না।

ফলে, সংগ্রাম সিং নীনা সরখেলের শরণাপন্ন হয়। নীনা তার কথামত কাজ করতে রাজী না হওয়ায় সে নীনার দাদা আর পঙ্গু ভাইটার সর্বনাশ করতে এগোল। তখন বাধ্য হয়ে নীনা রাজী হয়।

নীনা মণিশঙ্করের কাছ থেকে ডায়েরী আর ম্যাপটা নিয়ে এসে সংগ্রাম সিংকে দিল এবং জানাল যে মণিশঙ্করের চিঠি পেয়ে কলকাতা থেকে লোক এসেছে। খবরটা পেয়ে সংগ্রাম সিং চমৎকার অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে লাগল। কিন্তু ভাগ্যদোষে ফল হল বিপরীত।

আমার প্রথম থেকেই একটা সন্দেহ হয়েছিল। সেই সন্দেহ বদ্ধমূল হয় নীনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে। তাই সব সময় ছদ্মবেশী সংগ্রাম সিংয়ের ওপরে নজর রেখেছিলাম। কলকাতায় পৌঁছে সংগ্রাম সিং বুঝেছিল, মণিশঙ্কর আর সমরুকে না সরালে হয়তো সে ধরা পড়ে যাবে। তাই সে রাত্রে যখন তার দলের লোকেরা বেলেঘাটার বাড়িতে চড়াও হল, এবং সমরুকে হত্যা করেও যখন মণিশঙ্করের জন্যে বাড়ি দখল নিতে পারছিল না তখন সেই পিছন থেকে মণিশঙ্করকে গুলি করে।

মণিশঙ্করের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। গুলিটা তার ডান বাহুর পিছন দিকে লেগেছিল। গুলি লেগে মণিশঙ্কর মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে সংগ্রাম সিং তার দলের লোকদের বলে গলির মুখে গিয়ে অপেক্ষা করতে। কারণ তখন আমাকে হত্যা করাও তার খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল।

আমায় টেলিফোন করে সংগ্রাম সিং বিপরীত দিকের গলির মুখে অপেক্ষা করতে লাগল। সে ঐ দিক দিয়ে আমাকে আশা করেনি। কিন্তু যেহেতু আমি বিপরীত দিক

দিয়ে গলিতে ঢুকে পড়েছি সেই হেতু সে আমার গাড়িতে উঠে পড়ে আমাকে নির্দেশ দিল পাশের গলি দিয়ে পালাবার জন্যে।

আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল তাই প্রস্তুত হয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম।

এই পর্যন্ত বলে প্রফেসর সেন কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে পুনরায় বলতে লাগলেন, —তার পরের ঘটনা তোমরা সবাই জান। সংগ্রাম সিং অতি ধূর্ত। কিন্তু 'অতি চালাকের গলায় দড়ি' বলে একটা প্রবাদ আছে, এখানে ঠিক তাই হয়েছে। যাকে আমরা প্রথমে সংগ্রাম সিং বলে জেনেছিলাম সে লোকটা আসলে সংগ্রাম সিংয়ের ভাই উধাম সিং। খাণ্ডেল-ওয়ালাকে সে হত্যা করে আমারই চক্রান্তে। ইন্সপেক্টর হোসেন আমাদের কাছে সমস্ত ফাঁস করে দিয়েছেন। আশা করছি, এতদিনে ইন্সপেক্টর হোসেনের সাহায্যে পুলিস সংগ্রাম সিংয়ের ভাই উধাম সিংকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে।

এরপর তোমাদের জানাচ্ছি রত্নসিংহাসনের কোন হদিস সংগ্রাম সিং পায়নি। সেটা এখনও বিন্ধ্য পর্বতের কোন গুহায় চাপা পড়ে আছে। সময়মত আমাদের সেটা উদ্ধার করতে হবে।

—সমাপ্ত—

দড়ি লাফানর রেকর্ড

অনেকদিন আগেকার কথা। মেয়েটির বয়েস তখন বারো বছর। নাম ছিল কলেট ইয়ারোস। মেয়েটি ৩০ সেকেণ্ডে স্কিপিং রোপের উপর ১৫০ বার লাফাতে পারত। আধ মিনিটে ১৫০ বার লাফাতে দড়িটা ঘুরত ১৮০ মাইল বেগে। স্কিপিং রোপে লাফানর যা রেকড আছে তা গড়ে আধ মিনিটে ৪৭ বার।